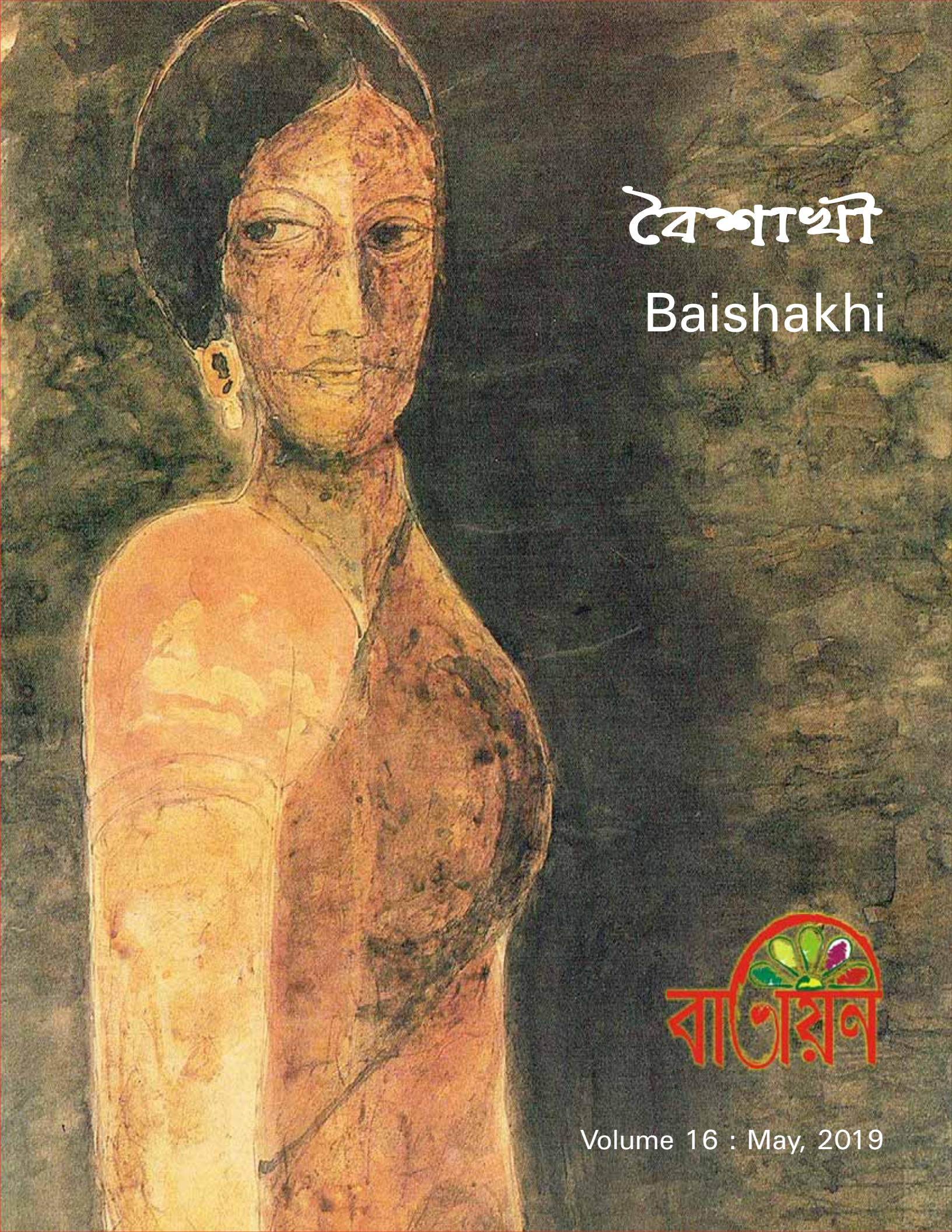

বৈশাখী

Baishakhi

বাতায়ন

Volume 16 : May, 2019

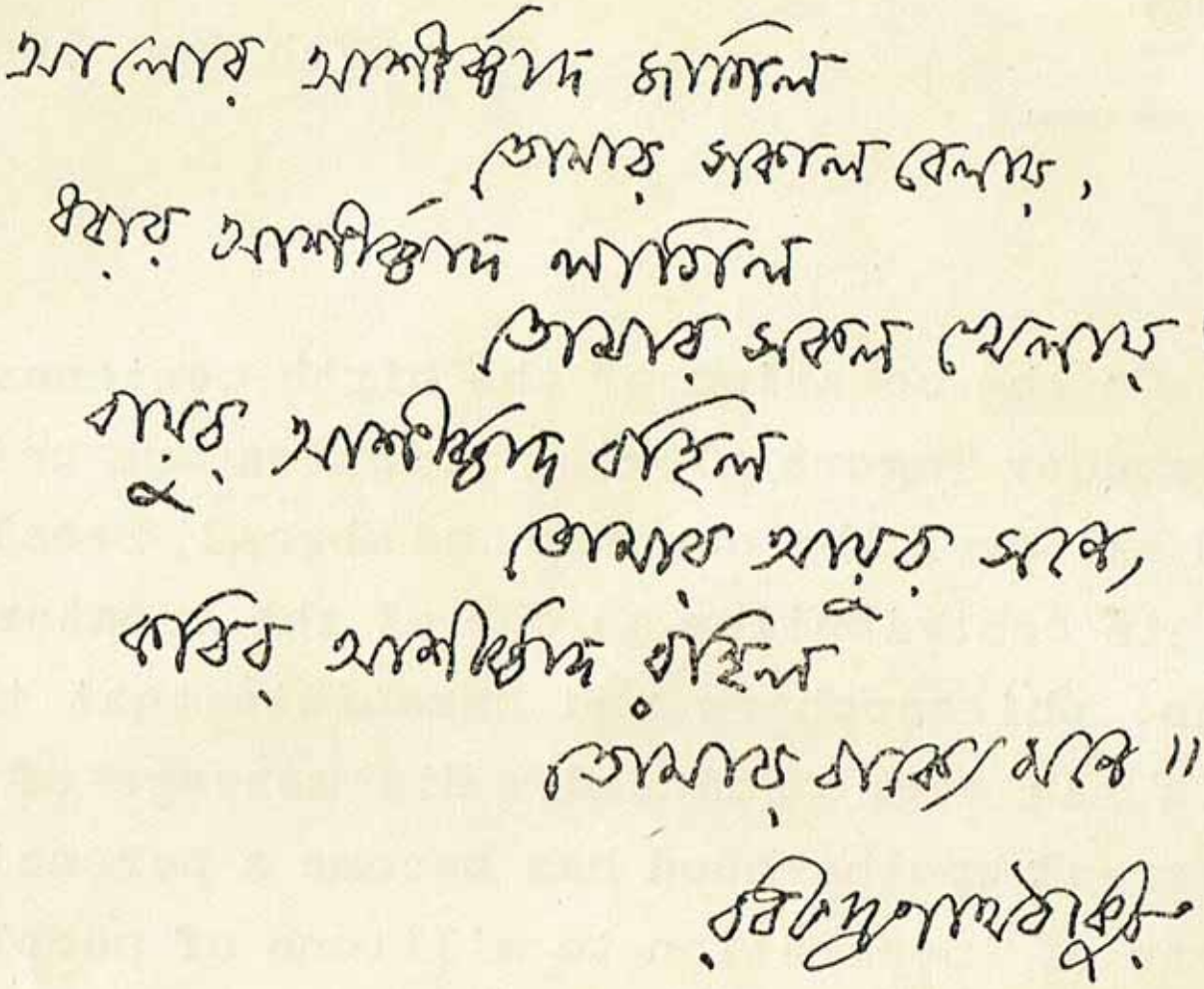

১৯৩৩ সালে দার্জিলিঙে সার নীলরতনের গৃহে অবস্থানকালে তাঁর দৌহিত্রী ইষিতা চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে লিখিত।

শ্রীমতী ইষিতা দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

("রবীন্দ্র-শতায়ন" থেকে গৃহীত)

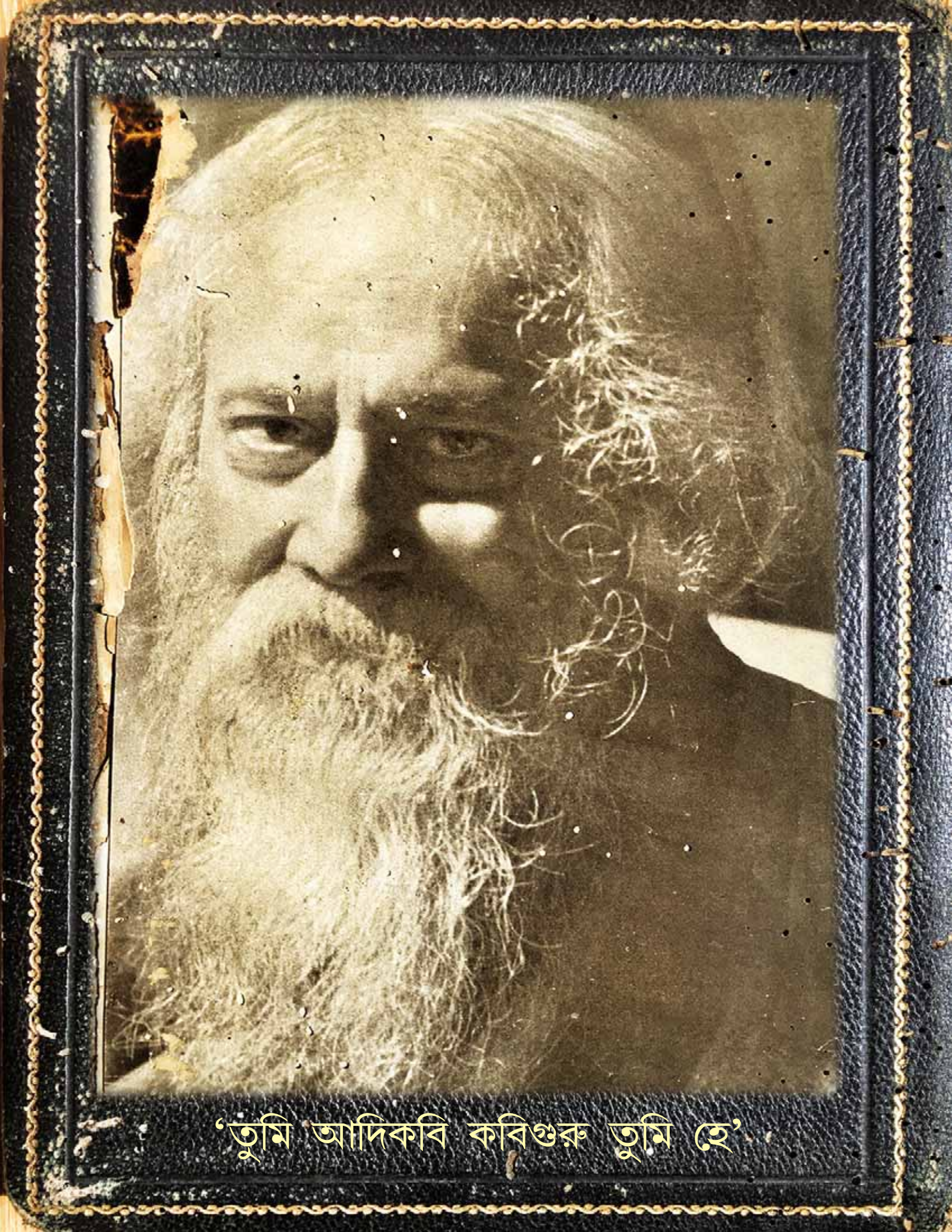

‘তুমি আদিকবি কবিগুরু তুমি হে’

প্রচ্ছদের গল্প — রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

কলকাতায় জুলাই মাস। এক অলস দুপুর। এমন সময়ে মন আপনিই স্মৃতিমেদুর হয়ে ওঠে। বুকের মধ্যে অকারণ শিরশির। ধুলো ঝেড়ে তাই পুরোনো বইয়ের গায়ে মোলায়েম হাত বোলানোর আদর্শ সময় এটা। স্বর্গীয়া শান্তি ব্যানার্জী ছিলেন বেথুন স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষা। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে অনেক মণিমুক্তা। পুত্রবধূ অনুশ্রী ব্যানার্জীর ডুবুরির মন। বইয়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ হাতে উঠে এল "রবীন্দ্র-শতায়ন"। রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত একটি স্মারকগ্রন্থ এটি। সংকলনের কাজটি তত্ত্বাবধান করেছিলেন মৃণালিনী এমার্সন। সত্যিই এক অমূল্য রত্ন। একে বিষয় রবীন্দ্রনাথ, তার ওপরে নানা বিদ্বজ্জনের অভিমত। এ বই সোনার খনির মতো। খুঁড়ে একমুঠো ধুলো পেলেও তা উজ্জ্বল। বইটি বাতায়ন পত্রিকার সংগ্রহশালায় চলে এলো অনুশ্রীদির হাত ধরে। রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতের লেখায় যে চিঠি দুটি এবারের রবীন্দ্রসংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ তা এই স্মরকগ্রন্থটি থেকে সংগৃহীত। আমাদের পাঠকদের সঙ্গে এই রত্নের সৌন্দর্য্য ভাগ করে নিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বেথুন বিদ্যায়তনের পক্ষ থেকে শ্রীমতী মৃণালিনী এমার্সন কতৃক প্রকাশিত হয় স্মারক গ্রন্থ ''রবীন্দ্র-শতায়ন'' । এই সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি দুটি ''রবীন্দ্র-শতায়ন'' স্মারক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত ।

The Back Cover Story by Samrat Ghosh, UK

The story of the book — "BALAKA" is interesting. My father, Shanker Kumar Bose, was gifted this by an acquaintance. He knew my father collected old curios. This gentleman purchased it from a bookstall on the footpath for Rs 5 only.

Interestingly, you will note that this book was printed in Allahabad, even though there were printing presses in Calcutta at the time. The reason for this is not clear. But this does prove that at least one Allahabad press had facilities to print in Bengali at the time.

This first edition of "BALAKA" was personally gifted by Rabindranath to Mr Amol Holme, who was Secretary to Tagore and later on worked for Calcutta Corporation.

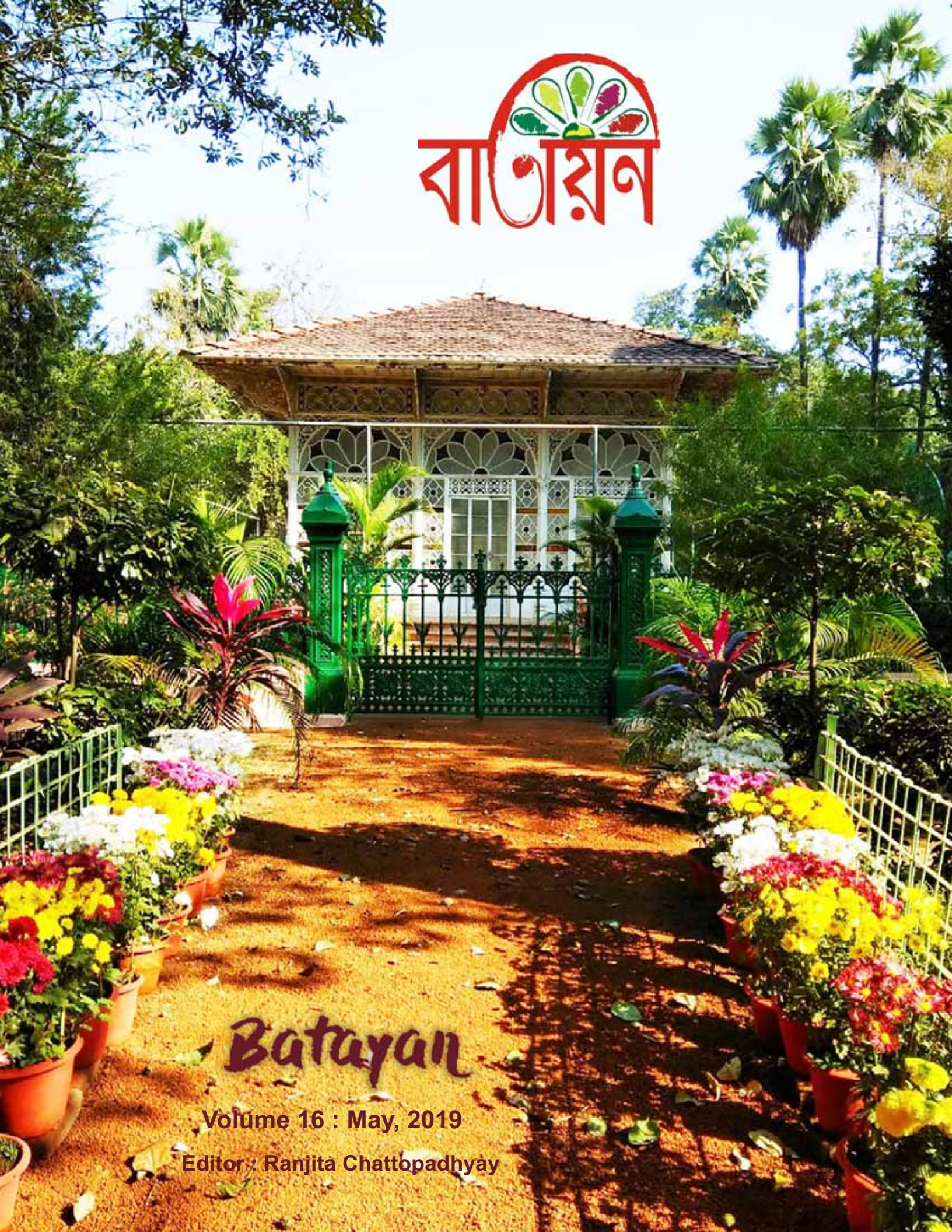

Volume 16 : May, 2019

Editor : Ranjita Chattopadhyay

বাতায়ন

Volume 16 : May, 2019

ISBN: 978-0-6481052-2-0

Editor
Ranjita Chattopadhyay

Coordinator
Manas Ghosh

Networking & Communication
Biswajit Matilal

Design and Art Layout
Kajal & Subrata

Website Design and Support
Susanta Nandi

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee & Tirthankar Banerjee

Photo & Artwork Credit

Front Cover : Painting by Rabindranath Tagore — collected from Thakurbarir Chitrakala, Deys Publishing.

Rabindranath Tagore Photo : From "BALAKA" 1st edition published by Indian Press, Allahabad, India in 1916.

Sugandha Pramanik **Title Page & Page 15**

Dr. Sugandha Pramanik is a lecturer in Applied Psychology in Kolkata. She is an avid reader, culinary enthusiast and a classical music lover.

Benjamin Ghosh **Artwork**

বেঞ্জামিন ঘোষ (মাঙ্গল্য) এখনো স্কুলছাত্র। তবে তার যাবতীয় আগ্রহ আবর্তিত হচ্ছে, ছবি আঁকাকে ঘিরে । পেন্সিল স্কেচ, রং-তুলি ছাড়াও সে ভালবাসে বিভিন্ন অপ্রচলিত উপাদানকে শিল্পের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে। অন্যান্য কাজের সঙ্গে নিয়মিত কমিক্স এঁকে চলেছে ছোটদের একটি শিক্ষামূলক পত্রিকার জন্য । বাতায়নের ধারাবাহিক পত্রিকায় বেঞ্জামিনের এই প্রথম কাজ । অতএব আমাদের সঙ্গে সেও তাকিয়ে আছে পাঠকের প্রতিক্রিয়ার দিকে ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

সম্পাদকীয়

এ এক বিচিত্র সময়। আসলে সময় সর্বদাই বিচিত্র। স্থান ভেদে সময়ের ছবি পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন মুলুকে এখন বসন্তকাল। ফুল ফুটছে কি ? কখনো কখনো। টিউলিপ আর ড্যাফোডিল মিলে হৈ হৈ করে রাঙ্গিয়ে দিচ্ছে এদেশের বাড়িগুলোর ফ্রন্টিয়ার্ড বা ব্যাকিয়ার্ড। আবার কখনো কখনো ঘাসের ওপর বরফের হালকা আস্তরণ। পুবের দেশ ভারতবর্ষের শহর কলকাতায় এখন বৈশাখ মাস। খবর পাই বেশ গরম পড়েছে সেখানে। আম, লিচু আর কাঁঠালের গন্ধে তার বাতাস ভারী হলো বলে। দক্ষিণ গোলার্ধের অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে এই সময়টা শরৎকাল। "এসেছে শরৎ হিমের পরশ" লেগেছে পাতায় বনে। প্রকৃতিতে যেমন পালাবদলই হোক না কেন এখন সময় খোলা বাতায়নের পাশে দাঁড়ানোর। নববর্ষে বাতায়ন পত্রিকার পক্ষ থেকে পাঠকদের জন্য উপহার "বাতায়ন বৈশাখী"।

সম্পাদকীয়ের শুরুতেই ঋতুবদল নিয়ে এতো কথা কেন ? এ বিষয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার মন্তব্য করেছিলেন, "আমি জানি কাব্য, গান প্রভৃতি রচনা সম্বন্ধে বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাঋতু আমার পক্ষে অনুকূল। সম্ভবত গ্রীষ্ম অন্যের পক্ষে বাধাজনক হাতে পারে। শীতের সময় আমার অন্য কাজে উৎসাহ হয়, গদ্য প্রবন্ধ লেখা, বক্তৃতা দেওয়া তখন আমার পক্ষে সহজ হয়, কিন্তু রস সাহিত্য রচনার উৎসাহ সে সময় দুর্বল থাকে। বোধহয় এই কারণেই আমেরিকায় ইংলন্ডে আমি বক্তৃতা প্রভৃতি লিখেছি কিন্তু কখনো কাব্য লিখি নি, লেখবার ইচ্ছা মনেও উদিত হয় নি।" তাই সময়ের পালাবদলে চিন্তার রং বদলায় বই কি। আর সেই রঙের প্রতিফলন ধরা থাকে লেখায়, আঁকায় বা আলোকচিত্রে।

পৃথিবীর যে গোলার্ধে যেখানেই বাঙালী এখন তার মনে একটি নাম। বৈশাখ মাস রবীন্দ্র জয়ন্তীর মাস। বৈশাখ মাস মানে বাংলা নববর্ষের মাস। কিন্তু বাঙালীর প্রাণে বৈশাখ মাসের মূল সুরটি ধরা আছে রবীন্দ্রনাথের গান, গল্প আর কবিতায়।

"তপ্ত হওয়া দিয়েছে আজ / আমলাগাছের কচি পাতায়,
কোথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে / নিমের ফুলে গন্ধে মাতায়।
কেউ কোথা নেই মাঠের পরে, / কেউ কোথা নেই শূন্য ঘরে,
আজ দুপুরে আকাশতলে / রিমিঝিমি নূপুর বাজে।
বারে বারে ঘুরে ঘুরে / মৌমাছিদের গুঞ্জসুরে
কার চরণের নৃত্য যেন / ফিরে আমার বুকের মাঝে।
রক্তে আমার তালে তালে / রিমিঝিমি নূপুর বাজে।"

'বৈশাখ'/ খেয়া

বৈশাখে বিশ্বজোড়া বাঙালীর বুকের মাঝে নূপুর বাজে রবীন্দ্রনাথের নামে। শুধুই কি বৈশাখ ? গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্তেও বাঙালীর হৃদয়ে রাজাধিরাজ রবীন্দ্রনাথ। ২৫ শে বৈশাখ বিশ্বকবির জন্মদিন। তাই বাতায়নের বৈশাখী শ্রদ্ধার্ঘ্য তাঁকে। খুব স্বাভাবিকভাবে তাই এই সংখ্যার প্রায় সব লেখারই কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথ। কোন লেখার প্রসঙ্গ সরাসরি রবীন্দ্রনাথ। আবার কোন লেখা রবীন্দ্রনাথের কোন গল্প, কবিতা বা নাটকের অনুপ্রেরণায় সৃষ্টি। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় মহাবিশ্বের মতো অনন্ত। অমৃতকলসের মতো জন্মের ১৫৭ বছর পরেও তিনি দেশ কাল জাতি নির্বিশেষে বহু সাহিত্যিকের সৃষ্টির রসদ যুগিয়ে চলেছেন। এই সংখ্যার প্রচ্ছদের নেপথ্যে বিশেষ ভাবনা চিন্তার স্বাক্ষর পত্রিকাটি একঝলক দেখলেই চোখে পড়বে। রবীন্দ্রনাথের লেখা বইয়ের প্রথম মুদ্রিত সংখ্যা ও দুষ্প্রাপ্য স্মারকগ্রন্থ থেকে প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন আমাদের অনুশ্রী দি ও তাঁর কলকাতা প্রকাশনা গোষ্ঠী।

বাতায়নের বৈশাখী সংখ্যায় আছে কিছু রবীন্দ্রাকবিতার অনুবাদও। পত্রিকাটি খুলে দেখলেই পাঠকরা লক্ষ্য করবেন তাদের সীমিত সংখ্যা। শিকাগোবাসী শুভম সান্যালকে বিশেষ ধন্যবাদ তাঁর রবীন্দ্রাকবিতার অনুবাদ আমাদের পাঠানোর জন্য। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই ব্যাপারে অন্য আর কাউকে ধন্যবাদ দেওয়া গেলো না। আমাদের অক্ষমতা যে আমরা রবীন্দ্রাসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আরো বহুলভাবে পৌঁছে দিতে পারি নি আজও। কিছু কিছু কাজ যে হচ্ছে না তা নয় কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। তাই বিদেশী লেখক বা পাঠকের চোখে রবীন্দ্রনাথ কেমন এ জিজ্ঞাসা রয়েই যায়। "শ্রদ্ধায় অশ্রদ্ধায় রবীন্দ্রনাথ" রচনায় সৌমিত্র চক্রবর্তী লিখেছেন "বাঙালীর কবিগুরুপ্রেম চিরকালই আন্তরিকতা আর হুজুগের এয়সা খিচুড়ি হয়ে রয়েছে যে চাল আর ডাল আলাদা করে কার সাধ্যি।" হুজুগের থেকে মন সরিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য অনুবাদের কাজ শুরু করার সময় এসেছে আজ। এই সংখ্যার সব পাঠকদের কাছে বাতায়ন পরিবারের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুরোধ রইলো। নিজে অনুবাদ করুন রবীন্দ্রসাহিত্য। উৎসাহ দিন লেখক বন্ধুটিকেও।

বাতায়ন পড়ে কেমন লাগছে ? ইতিমধ্যে সুজয় দত্ত বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন "ফিরে দেখা" সংখ্যাটি তাঁর কেমন লেগেছে। এই সংখ্যায় অর্পিতা চ্যাটার্জী জানিয়েছেন "পলাশের রং" সংখ্যা সম্বন্ধে তাঁর মতামত। এই মতামতগুলো তো পড়বেনই তবে শুধু অন্যের মতামতের ভরসায় না থেকে আপনি নিজের মতো করে মূল্যায়ন করুন না পত্রিকাটির। আমাদের পাঠান আপনার সুচিন্তিত অভিমত। কোথায় পাঠাবেন ? c _ranjita @yahoo.com এই ঠিকানায় ইমেইল করুন। আমাদের ধারাবাহিক বিভাগ "কাগজের নৌকো" মানস ঘোষের সম্পাদনায় তরতর করে এগিয়ে চলেছে। খুলে পড়তে আর পড়াতে ভুলবেন না। বাতায়ন ইংরাজী বিভাগটি যেন উপেক্ষা করবেন না কোনোভাবে। গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, বইয়ের আলোচনা – নানা মণিমুক্তোর সন্ধান পাবেন সেখানেও।

এখন আর কিছুদিনের অপেক্ষা। তারপরেই প্রকাশিত হবে বাতায়ন সংকলন। আশা করি অন্যান্যবারের মতো এবারেও আপনারা ভালোবাসা আর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

বাংলা ১৪২৬ ভালো কাটুক সকলের।

নববর্ষের শুভেচ্ছা সহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক – "বাতায়ন", বাংলা বিভাগ

প্রিয় সম্পাদিকা,

ভালো আছেন আশা করি। শীতের শেষে বসন্ত সমাগমে কাউকে খারাপ থাকতে নেই যে। মার্চ ২০১৯ এ প্রকাশিত 'বাতায়ন'-এর পঞ্চদশ সংখ্যা পড়লাম জানেন। পড়তে শুরু করার আগে প্রচ্ছদ দেখে মনে পড়ল অনেকদিন আগে হাজারীবাগ অঞ্চলে দেখা পলাশ জঙ্গলের কথা। ভালো করে দেখার সুযোগ তখন হয়নি। ট্রেনযাত্রার পথে জানলার বাইরের সঙ্গী ছিল ওরা। বড় মন টেনেছিল জানেন। কিন্তু দাঁড়াবার সময় ছিল না। আজ বাতায়নে সেই 'পলাশের রং'। মাটির রং। মাটির টান বড় অমোঘ তাই না ? নিজের শিকড়, নিজের ভাষা জড়িয়ে নিয়েই বোধহয় আমাদের দৈনন্দিন কথকতা। আমাদের উদ্বাস্তু হতে দেয়না আমাদের স্মৃতিরা আর আমাদের ভাষা। আপনিও বলেছেন সেকথা সম্পাদকীয়তে দেখলাম। আপন ভাষাটি বেঁচে আছে বলেই বোধহয় এখনো এককোণে টিকে আছি আমরা নিজের ঐশ্বর্য্যটি আগলে। নইলে কবেই এই ভুবনগ্রামের গড্ডালিকা স্রোতে ভেসে যেতাম। ভাষাটি বেঁচে আছে বলেই এই এত এত অক্ষর কবিতা হয়ে উঠছে প্রতিদিন। ওহো, কবিতার কথায় বলি, বড় মধুর কিছু কবিতা গুচ্ছ নিয়ে এসেছেন বাতায়নে। কবিতাদের দেখা পাওয়া সহজ নয় মোটে। এ আমি হাড়ে হাড়ে জানি। সব অক্ষর কবিতা হয়ে ওঠে না। কবিতা ধরা দেয়না সহজে। তার আসার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গতিটি নেই। সুজয় দত্ত কেমন সাবলীল ভাবে বলেছেন সেকথা। আর এই ভুবনগ্রামের বাসিন্দা হয়ে মাতৃভাষার চর্চা করার এবং ছড়িয়ে দেবার সুযোগ কেবল আপনারা আছেন বলেই। এবারের বাতায়নে মানস ঘোষ বলেছেন সেকথা অবশ্য।

এবারের বাতায়ন, 'পলাশের রং', আবীরের ছোঁয়া, বসন্তোৎসবে প্রথম প্রেমের আবেশ মনে করিয়ে দেয় তাইনা বলুন ? প্রেম যে বেঁচে থাকার প্রধান শর্ত। আপনি যদি বলেন খিদে বা তৃষ্ণার কথা, তবে বলি, বেঁচে থাকতে গেলে খিদে বা তৃষ্ণার কথা আসে। কিন্তু বেঁচে থাকব কেন – এই প্রশ্নের উত্তরে বোধহয় প্রেমই আসে। আচ্ছা, উদ্দালক ভরদ্বাজ বাবুর অক্ষর সাজিয়ে আঁকা পেলব ছবিটা দেখলেন ? 'প্রয়াস' শিরোনামে আঁকা ছবিটার কথা বলছি। মনে হচ্ছিল না – 'আরে হ্যাঁ, ঠিক এইটা, ঠিক এইটাই তো আমি বলতে চাই, পেতে চাই। আমাদের নিজের নিজের 'নিখিল', বা 'শিশির' বা অন্য আর কোনো নামের প্রেমের কাছ থেকে। অক্ষর থেকে প্রেম অবয়ব পায় এ লেখা পড়ে। স্নেহাশীষ ভট্টাচার্য্যও লিখেছেন একই কথা। প্রেমকে ফিরে পেতে চাওয়া বোধহয় চিরন্তন। প্রেম বসন্ত বাতাসে। প্রেমের বয়স গেছে বুঝি ? 'ভালবাসবার তো বয়স হয়না।' ভালোই বাসব না হয়। সৌমিত্র চক্রবর্তীর 'আজকাল' লেখাটি অনেকদিন মনে থাকবে আমার। সৌমিত্রবাবুকে ধন্যবাদ জানাবেন এমন একটা লাইন লেখার জন্য। ইন্দ্রানী দত্তের 'পিংপং' গল্পটি যেমন, জীবন যাপনের প্রাত্যহিকতার বর্মের আড়ালে, জমিয়ে রাখা প্রেম, ভালোলাগা অল্প করে স্বাদ নেওয়া। প্রেম নয় বোধহয়, ভালবাসা তো বটেই। ভালোবাসতে বয়স লাগে না, পুরুষ স্ত্রী ভেদ লাগে না, কিচ্ছুটি লাগে না। ভালোবাসতে কেবল ভালোবাসাই লাগে। শ্যাম-রাই এর প্রেমের ছবি এঁকেছেন রবিরশ্মি ঘোষ। পুরোনো বাংলা ভাষার এত সাবলীল প্রয়োগ বর্তমানের লেখকদের মধ্যে দুর্লভ। এ লেখা লিখতে আবেগ, ভাষা জ্ঞান ছাড়াও পড়াশুনা লাগে। চটজলদি সাফল্যের যুগে যা ক্রমশঃ বিরল হয়ে উঠছে। ব্যক্তিগত ভাবে রবিরশ্মিবাবুকে আমার কুর্নিশ জানিয়ে দেবেন দয়া করে। এত সুন্দর লেখা দুটি চয়ন করার জন্য আপনারও ধন্যবাদ প্রাপ্য অবশ্য। পড়লে মনে আশা জাগে, এখনো বাংলা ভাষা টিকে থাকবে বহুদিন যদি ভাষার ইতিহাস চর্চাটুকু এভাবে বেঁচে থাকে।

আশার কথাই যদি আসে তবে সঞ্জয় চক্রবর্তীর লেখাটির কথাও বলতে হয়। এত ঋণাত্মক জীবনযাপন আমাদের, অন্ধকার তো থাকবেই, তাই বলে আলোর কথা না বললে যে রাত কাটে না। আমাদের তো বাঁচতেই হবে। আমরা যে 'অমৃতের সন্তানসন্ততি', আমাদের হাত ধরেই 'একদিন ঝড় থেমে যাবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে'। তপনজ্যোতি মিত্র লিখেছেন সেকথা। এত রক্ত, এত বারুদ প্রতিটি সীমান্তে আজ। আলো দিয়ে বারুদের গন্ধ মুছে দিতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে রক্তের দাগ মুছে দিয়ে কবিতা লিখি। দেবাশীষ ব্যানার্জীর লেখাটি পড়ে বাস্তব পাহাড়ের মত বুকের ভেতর চেপে বসল জানেন। আর শুধু সীমান্তের কথাই বা বলি কেন, মৃত্যু যে কাউকে ছাড়ে না। আমার আপনার প্রতিটি মানুষের বয়সের সাথে সাথে বাড়ে অভিজ্ঞতা আর কি বাড়ে জানেন? আমাদের আজীবনের হারিয়ে ফেলা টুকরো টুকরো ছবির তালিকা। প্রিয়

মানুষ জন্মের মত 'বিদায়' নেয় আর তার সাথে নিয়ে যায় সেই মানুষটির সাথে জড়িয়ে থাকা আমাদের একটুকরো জীবন। শুভ্র দাস লিখেছেন। বড় কষ্টের এই ক্ষয় হতে থাকা স্মৃতি। তাই তো রোদের কথা লিখি, ফেলে আসা আলোর কথা লিখি। যাতে ভুলে না যাই, যা থেকে উত্তাপ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি।

যাক যে, যা বলছিলাম, কবিতার কথা। আচ্ছা বলুনতো এত বৈচিত্রপূর্ণ কবিতার সম্ভার নিয়ে এলেন কি করে? এত রকমের কবিতা, লিমেরিক। এই যেমন ধরুন না শুভ্র দত্ত-র লেখাটি, পড়লে আপাত হাস্যরসের আড়ালে স্যাটায়ারের হাতুড়ির ঘা টি কিন্তু ঠিকই নজরে পড়ে। আর ওই রজত ভট্টাচার্য্যের ছোট্ট লিমেরিকটি। আহা নিখুঁত, একটি শব্দও বেশি বা কম নেই। নির্মল। বেশ লাগলো পড়ে জানেন। ও হ্যাঁ আর একটা কথা, অভীকবাবু মানে অভীক মজুমদার যে নিজের সবটুকুনিকে মিশিয়ে দেবার কথা লিখেছেন না, সেলিম চিস্তির দরগায়, জয়পুরে বা হুমায়ূনের সমাধিতে, ওমনটি বুঝি সবারই হয়। আমরা ওঁনার মতন বুক নিংড়ে বলতে পারিনা। আচ্ছা আপনার কখনো মনে হয়নি? পাহাড়ি ছোট্ট মনাস্ট্রির মধ্যে ধূপের গন্ধে? বা ধরুন আকাশ আর সাগর যেখানে মিশেছে সেই দিগন্তরেখার নীলে? কিংবা ধরুন চেনা ঘরের কোণে একা বসে সরোদে 'দেশ' রাগের বন্দিশ শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে তানের মীড়ের মতন পেলব হয়ে গলে যায়নি কখনো আপনার সমস্ত অস্তিত্ব?

ওই দেখুন আবার আবোল তাবোল বকছি চিঠি লিখতে বসে। একখানা কাজের কথা বলি, অতীশ ব্যানার্জীর 'বিধাতার ছুটি' লেখাটি পড়লাম জানেন। অতীশ বাবুর লেখা আগে পড়িনি কেন একথা ভাবছিলাম। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পড়ছি। যেটি লিখছি সেটিই ভাবছি কিনা তা লেখা পড়লে বোঝা যায়। যদি খুব না ভুল করে থাকি, এ লেখায় আমার অচেনা অতীশবাবুর কিছুটা পরিচিতি পেলাম। এই জাদু কয়েনটি বেঁচে থাকুক অতীশবাবুর জীবনে। ভাল থাকুন উনি।

দেবশ্রী মিত্রের 'গুলাবচন্দ কিরানা স্টোর্স' পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল জানেন ? এ আমরা যারা শিকড় তুলে বিদেশে এসেছি তাদের সক্কলের গল্প। আমাদের বাবামায়েরা না পারে আমাদের ছেড়ে থাকতে। আমরা না পারি তাদের ছেড়ে নিশ্চিন্তে থাকতে। তারা না পারে বিদেশের মাটিতে থিতু হতে, না পারে আজন্মের বাড়ি ঘর দুয়ার ভুলতে। আমরা না পারি আমাদের মাটিতে ফিরে যেতে, না পারি বিদেশে তাদের নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে। এ যেন অন্তহীন এক যাঁতাকল। আর তারমধ্যে আমাদের প্রজন্মের কিছু মানুষের প্রাণপণে আরো আরো আরো বেশি করে অতীতকে অস্বীকার করে আধুনিক হতে চাওয়ার মূর্খামি আমাদের বাবা মায়ের থেকে আরো দূরে নিয়ে যায়। খুব সত্যি আর খুব নির্মম ছবি এঁকেছেন দেবশ্রী।

মঞ্জিষ্ঠা রায়ের 'পাহাড়ী আতঙ্ক' পড়লাম। অদ্ভুত ব্যাখ্যাহীন ঘটনা। তবে আমার মনে হয়, আমরা আমাদের বর্তমান বিজ্ঞান চেতনা দিয়ে যে ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারিনা তাকে এককথায় নস্যাৎ করা যায় না। বিজ্ঞানের ছাত্রী বলেই তা করতে আমার বাধে। বিজ্ঞান বলে, প্রমান ছাড়া বিশ্বাস করোনা। সাথে সাথে বিজ্ঞান এও বলে, যা ব্যাখ্যা করতে পারছোনা তা এখন ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না বলে পরেও যাবেনা, এমনটি নয়। সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে গবেষণা করা আমাদের ট্রেনিং এর মধ্যেই পড়ে। সুতরাং .....। তবে নিজের কাছের মানুষকে ওই অবস্থায় দেখাটা কতবড় কষ্টের সেটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়।

তিতাস মাহমুদের 'ভাষা দিবস' পড়লাম। ভাষাদিবস নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছু লেখা পড়েছি এবারেও। কিন্তু এই লেখাটির মত এত সপাট, নির্মেদ লেখা পড়িনি। না, একটাও পড়িনি। দায়িত্ব নিয়ে বলছি। মনের কথা, কথা বলে বোঝাতে পারি বলেই আমরা গান গাওয়ার বদলে গালি দিতে শিখেছি। কুশল জিজ্ঞাসা করার বদলে ক্রোধ প্রকাশ করতে শিখেছি কেবল গলায় আমার আওয়াজ আছে বলেই। আর এক লহমায় যাঁরা সেই স্বরটুকু খোয়ালেন তাঁরা ? অথবা যাঁরা যা বলতে চাইছেন তা বলে বোঝাতে পারছেন না সেই সব পোস্ট স্ট্রোক আফেজিয়া রোগীরা ? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এই ঘটনা যেন কারো সাথে কখনো না ঘটে। ভাষা আমাদের শক্তি। মৌনতা আসার আগেই যেন আমরা তার যথার্থ মর্যাদা বুঝতে পারি।

আমার কাজের ভাষা আর আমার মায়ের বোঝার ভাষা আলাদা। আমার কাজের কথা ঠিক করে আমার মাকে বোঝানোর দায়িত্ব তো আমারই। নইলে কোনোদিনই বিজ্ঞান বইয়ের পাতা ছেড়ে আসল জায়গায় নিজের জায়গা করে নিতে পারবে না। তাই ঠিক করলাম জানেন অল্প অল্প করে আমার মায়ের বোঝার ভাষায় আমার কাজের কথা লিখব। তাই লিখলাম 'অসমাপ্ত শুক্রতা'। এত এত বড় বড় মানুষ সারা জীবন ধরে এত মূল্যবান গবেষণা করছেন অথচ কেবল মাত্র ভাষার ব্যবধানে ইংরেজি না জানা বা বিজ্ঞান এর পরিভাষা না জানা মানুষের কাছে এসব না জানাই থেকে যাবে ? তাই দায়িত্ব থেকেই এ লেখা।

যদিও কোনো একটি যুদ্ধের স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের ব্যাপকতা বোঝা বা সে সম্পর্কে কেবলমাত্র একটি লাইনও লেখা আমার মত মানুষের পক্ষে বাচালতারই নামান্তর। তবুও বলি, প্রাণভরে পড়লাম আনন্দম শাস্ত্রীর 'কলকাতা একাত্তর' লেখাটি। ছেলেবেলার নিষ্পাপ মজা, সাথে সাথে যুদ্ধের সময়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বা শিশুমনে তার প্রভাব কতখানি তার খানিক আন্দাজ পেলাম।

'বইমেলায় একদিন' পড়তে পড়তে স্নেহাশীষ ভট্টাচার্য্য এর সাথে আমারও একদিন বইমেলায় হেঁটে বেড়ানো হয়ে গেল জানেন। মন ছুঁয়ে গেল স্টল না পেয়ে 'স্টল নম্বর শূন্য' থেকে শুরু করা অদম্য ইচ্ছের ছবি দেখে। ভালো হোক ওদের। আর শীর্ষেন্দু-শরদিন্দু গুলিয়ে ফেলা সিজিন্যাল ভাষাপ্রেমীদের স্নেহাশীষ বাবু কেন আমরা বোধহয় সকলেই কমবেশি দেখেছি। কতদিন যাওয়া হয়ে ওঠেনা বইমেলায়। আপনি কবে শেষবার কলকাতা বইমেলায় স্টলে ঢুকে বই ছুঁয়েছেন আর আদর করে প্রথম পাতাটা খুলে জগৎ ভুলেছেন? আমি বোধহয় ২০১২ সালে শেষবার।

Shuvra Das লিখেছেন 'Unfinished Stories' আবার সেই জীবনের রয়ে যাওয়া, না হওয়া কিছু কথা। আমাদের প্রিয়জনদের অসমাপ্ত জীবন। Madhurima Das এর 'Makerspace' অসামান্য এক দর্শন। "I grab an exacto knife to try and slice away my inhibitions". আহা যদি সত্যই পারতাম ! যদি সত্যিই জীবনের বেয়াড়া চাহিদাদের একধমকে চিরদিনের মতন চুপ করিয়ে দেওয়া যেত ! যদিও তা হবার নয়। আর সবটা বুঝতে পেরেও বেমালুম জীবনকে বয়ে নিয়ে যাওয়াতেই বোধহয় ম্যাজিক। মধুরিমা তো বলেইছেন "because where there is learning, there is magic". বড় ভালো লেখা মধুরিমার। Jill Charles সম্পাদকীয়তে Kathy Powers এর লেখাটি সম্পর্কে লিখেছেন – "Kathy Powers shows us the best and worst episodes of an entire life with very few words in Some Nouns." আমি আর বেশি কি বলি ? কয়েকটা শব্দে একটা গোটা জীবনের ধাক্কা দেওয়া ঘটনাগুলো লিখে ফেলা যায় ? যায় বুঝি ? যায় তো। দেখলাম। শিখলাম।

আচ্ছা আপনি তো সম্পাদিকা, আপনাকেই বলি বরং, আরো কিছু ছবি রাখা যায় বাতায়নে ? এই যে কেমন সুন্দর 'Postman Butterfly' দেখলাম Jerry Kaiser এর।

M. C. Rydel এর 'The Fabric of Coincidence' এর মতন সত্যি সত্যি এমন সমাপতন হয়? দেজভু হয় জানি। আশ্চর্য্য জিনিসের প্রতি আমাদের মন সর্বদা আগ্রহী। তাই বোধহয় আমরা রূপকথা ভালোবাসি। যেকোনো মানুষকে খুব চেনা মনে হয়েছে কখনো আপনার? আমার হয়েছে জানেন। এই আমার কাজের ইনস্টিটুটেই একজন আছে। মেয়েটিকে দেখলে আমি অকারণেই খুশি হয়ে যাই। মনে হয় কত কালের প্রিয় বন্ধু বুঝি। গতজন্মের চেনা? হবেও বা।

মেরি অলিভারের কথা জানলাম Jill Charles এর কাছ থেকে। অবাক হবেন না। সত্যিই পড়িনি ওঁনার কবিতা। কেমন করে পড়ব বলুন দিকি? আপাদমস্তক আজন্ম বাংলা পড়া গ্রামের বাংলা ইস্কুলে বা বন্ধু মহলে মেরি অলিভারের কবিতা পড়া বা পড়ানো হয় নাকি? Jill কে আমার হয়ে একটু ধন্যবাদ দিয়ে দেবেন দয়া করে? Jill বললেন বলেই তো জানলাম। এবার পড়ব। ওহ হ্যাঁ Jill এর লেখা 'Arrival' এর রিভিউ পড়লাম। যদিও আগেই দেখেছি ছবিটা। ভাল লাগলো পড়তে।

ভাষা দিবসের আশেপাশে ভাষা নিয়ে এমন সুন্দর একটি সিনেমার রিভিউ খুব ভাল একটি নির্বাচন। সত্যিই আমরা চাইলে ভালবাসার ভাষা শিখতেই পারি। তা গ্রহান্তরের হলেও।

Susim Munshi র অসাধারণ একটি অবসর যাপন ও ব্রেকফাস্টের বর্ণনা শুনলাম। রেসিপি গুলো টুকে রাখছি বুঝলেন। ভোজনরসিক বাঙালির অবসরে রসনা তৃপ্তিই তো শেষ কথা। কেমন?

আর শেষে বলি, Souvik Dutta র 'Purusha Suktam' লেখাটির কথা। এই সম্পর্কে একটি বাক্যও আমি বলব না। কারণ আমার সে যোগ্যতা নেই। এমন একটি বিষয় সম্পর্কে পড়ে, আত্মস্থ করে, যিনি লিখতে পারেন তাঁর সম্পর্কে কিচ্ছু বলা আমার সাজে না। তবে এটুকু বলি, এমন লেখা আরো পড়তে চাই। কারণ, অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে আমি সংস্কৃত পড়তে পারিনা। পারলেও বুঝতে পারিনা। আমার অক্ষমতা। তাই মূল লেখাগুলির মর্মোদ্ধার করা আমার হয়ে উঠবেনা। আর ইংরেজিতে অজস্র ভুল বা দায়সারা ব্যাখ্যাযুক্ত লেখা পড়ে বিরক্তিই আসে কেবল। তাই শৌভিকবাবুর মতন মানুষের জন্য যদি কিছুটা জানা যায়। ওঁনার জন্য শ্রদ্ধা রইল।

অনেক গল্প হলো। আজ শেষ করি কেমন। বসন্তে আশেপাশে গাছেরা কুঁড়িগুলো ফোটতে শুরু করেছে তো? এখানেও খবর এসেছে। প্রতিটা পাড়ার প্রতিটি গাছের শেষ প্রস্তুতি একদম সারা হলো বলে। আর কদিনের অপেক্ষা। তারপরেই নীল দিগন্ত ফুলের আল্পনা। ততদিন খুব ভাল থাকবেন।

ইতি

অর্পিতা

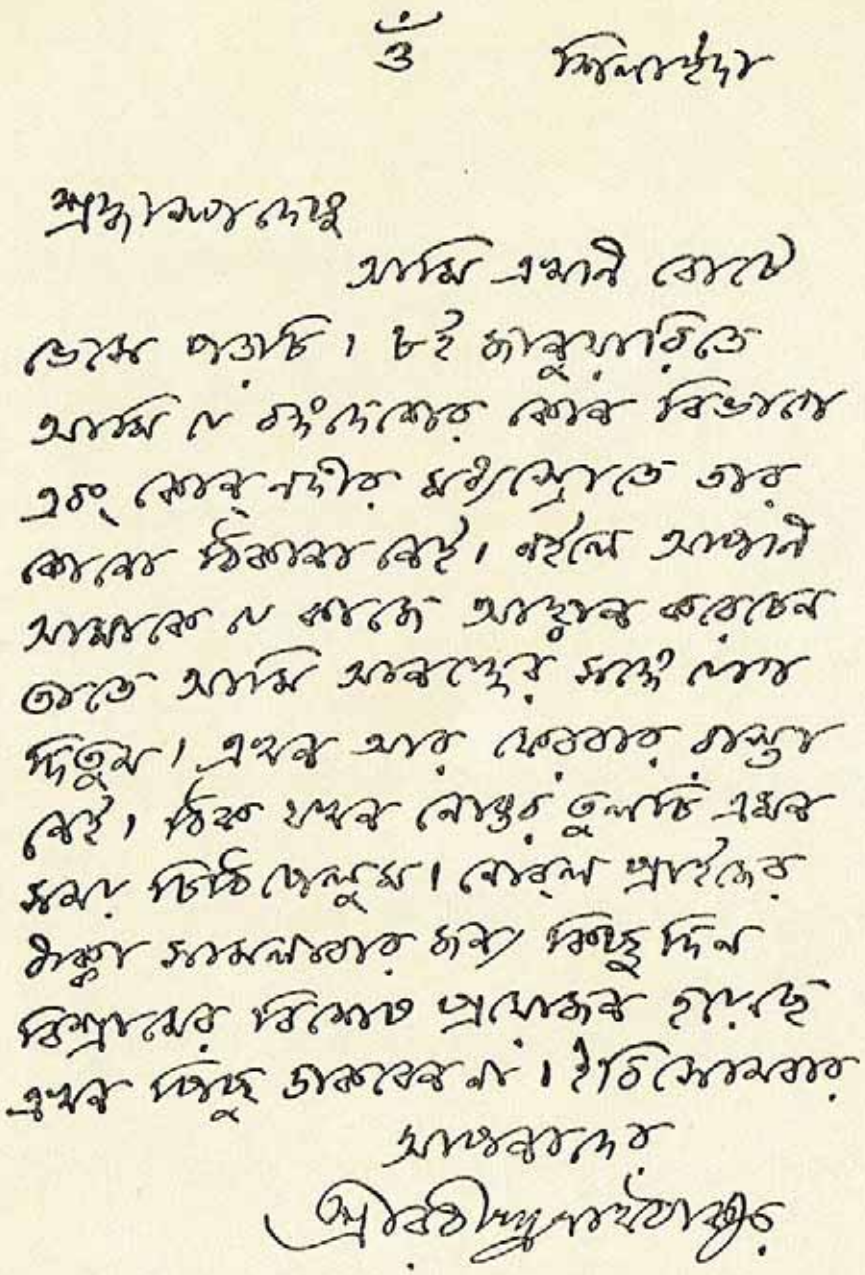

এই চিঠিখানি লেখা হয়েছিল নববিধান-প্রচারক স্বর্গত ভাই প্রমথলাল সেন মহাশয়কে—কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে। ডাকের ছাপে তারিখ—৬ই জানুয়ারি ১৯১৪।

("রবীন্দ্র-শতায়ন" থেকে গৃহীত)

সূচীপত্র

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ

জন্মের প্রথম শুভক্ষণ	তন্ময় চক্রবর্তী	8
জাতীয়তাবাদ – রবির আলোয়	মানস ঘোষ	20
On Tagore's Child Literature	Indrani Mondal	27

কবিতায় স্মরণ

আমার রবীন্দ্রনাথ	মৌসুমী ব্যানার্জী	11
রবি বন্দনায়	সঞ্জয় চক্রবর্তী	12
ভুবনডাঙ্গার কবি	তপনজোতি মিত্র	19
বাইশে শ্রাবণ	রুবাইয়া জেসমিন (জুঁই)	23
পঁচিশে বৈশাখ	জয়দেব সাহা	23

একান্ত আপন - শ্রদ্ধার্ঘ্য

আমার প্রিয় রবিঠাকুরের কবিতা	মনীষা বোস	13
'পরাণসখা বন্ধু হে আমার'	অর্পিতা চ্যাটার্জী	24
শ্রদ্ধায়-অশ্রদ্ধায় রবীন্দ্রনাথ	সৌমিত্র চক্রবর্তী	38
আমার কাছের রবীন্দ্রনাথ	সুনয়না দত্ত ইয়াং	40

গল্পে, কবিতা, নাটক - প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ

তস্কর	রবিরশ্মি ঘোষ	16
তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা	শাশ্বতী বসু	29
ছোটগল্প – সূর্যাস্ত পর্যন্ত	পারিজাত ব্যানার্জী	33
সুগন্ধা ও বাতাসবাবু	দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী	36
বসন্ত	দেব বন্দ্যোপাধ্যায়	42
ইয়েসেনিন গ্রামে	উদ্দালক ভরদ্বাজ	43
'আজি ঝড়ের রাতে'	রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়	51
স্বপ্নআলেখ্য	স্নেহাশিস ভট্টাচার্য	59

হাস্যরস ও রবীন্দ্রনাথ

রবিন কুক	সুজয় দত্ত	47

Adaptation

Heave Ho! **Robi Thakoor's 'Khorobayou Boi Bege'**	Shubham Sanyal	55
The Hero — a Child's Fantasy		56
The Mantra of Life! **Robi Thakoor' "Tomar Holo Shuru"**		58

বইয়ের ঘর

আমার রবিঠাকুর	তন্ময় চক্রবর্তী	62
Tagore for you	Satyam Roychowdhury	64
পাড়াতুতো চাঁদ	বিশ্বদীপ চক্রবর্তী	66

আমাদের সামনে মস্ত দুটো ভোজের থালা, আকাশ আর সাগর । অভ্যাস দোষে প্রথমটা মনে হয়, এদুটো বুঝি শুন্য থালা । তার পর দুই-একদিন লঙ্ঘনের পরে ক্ষুধা একটু বাড়লেই তখন দেখতে পাই, যা আছে তা নেহাত কম নয় । মেঘ ক্রমাগত নতুন নতুন রঙে সরস হয়ে আসছে, আলো ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন স্বাদে আকাশকে এবং জলকে পূর্ণ করে তুলছে ।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তোসামারু জাহাজ, জাপান যাত্রী
২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

তন্ময় চক্রবর্তী

জন্মের প্রথম শুভক্ষণ

ভোরের আলো সবেমাত্র ফুটে উঠেছে। উনপঞ্চাশ নম্বর পার্ক স্ট্রিটের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল মেয়েটি। দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সে। আধোঘুমে মেজমামা সত্যেন্দ্রনাথ। পাশেই নতুন মামা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঘর। সকালের অতিথির গন্তব্য অবশ্য অন্য ঘরে। তিনি তখনও ঘুমোচ্ছেন। মেয়েটি আলগোছে বিছানার পাশে রেখে দিল নিজ হাতে গাঁথা বাড়ির বাগানের বকুলফুলের মালা। পায়ের কাছে একজোড়া ধুতি-চাদর, সঙ্গী বেলফুলের মালা। প্রণাম করতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল কবির। হঠাৎ করে জেগে উঠল বাড়ি ... রবির জন্মদিন। "রবিমামার প্রথম জন্মদিন উৎসব আমিই করাই"। এমনটিই লিখেছিলেন কবির ভাগ্নী সরলা দেবী (স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা) "জীবনের ঝরাপাতা" গ্রন্থে।

তারপর কেটে গেছে বহু বছর। সে বছর শান্তিনিকেতনে গরমের ছুটি। কবির শরীরও ভাল নেই। তেইশে বৈশাখের সকালে 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটিকে 'হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ' গানে রূপান্তরিত করলেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় শান্তিদেব ঘোষের স্বরলিপি সহ ছাপা হল সেই গান। আশ্রমিকদের উদ্যোগে ঘরোয়া জন্মদিন। সকালে সন্ধ্যায় বৈতালিক ও মন্দিরে উপাসনা। শেষ বিকেলের নরম আলোতে সমবেত হয়েছেন সবাই উত্তরায়ণে। মঞ্চস্থ হল নাটক 'বশীকরণ'। রোগজর্জর ক্লান্ত কবি পুরো সময় উপভোগ করলেন জন্মদিনের অনুষ্ঠান। মৃদুভাষ্যে বললেন,

'সংসারে বড় জিনিস হচ্ছে প্রীতি – খ্যাতি নয়'।

জীবদ্দশার এই শেষ জন্মদিনের প্রাক্কালে লিখেছিলেন সেই মায়াময় আশ্চর্য কবিতাটি –

"আমার এ জন্মদিন মাঝে আমি-হারা
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
...
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ
...
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে"।

তারপর তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রায়। তিনি মহাপ্রাণ। তিনি অনিঃশেষ। আমরা পালন করে চলেছি জন্মজয়ন্তী মহোৎসব।

যদিও পরিবারের বাইরে থেকে প্রথম জন্মদিনের শুভেচ্ছা অভিনন্দন এসে পৌঁছেছিল কবির উনপঞ্চাশ বছর বয়সে (১৩১৭) কিন্তু শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের উদ্যোগে, কবির পঞ্চাশ বছর বয়সে (১৩১৮) কবির জন্মদিনের উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। ভোর পাঁচটা। আম্রকুঞ্জে উৎসবের আয়োজন। আলপনা, ফুলমালায় ঝলমল করছে চারিদিক। ছাত্রদের নিয়ে গান ধরলেন দিনেন্দ্রনাথ। আচার্যের ভূমিকায় ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায়। অভিনন্দন পাঠ করলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। সভায় উপস্থিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দূর থেকে দেখা গেল কবি আসছেন। ফুল-

মালা-চন্দনে জন্মদিনের আসন গ্রহণ করলেন কবি। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হল নাটক 'রাজা'। ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে জন্মোৎসবের সে সভায় অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। যা নাকি প্রথম রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ।

১৪ মাঘ, ১৩১৮। কলকাতা টাউন হল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজন করলেন রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের। 'দ্য বেঙ্গলি পত্রিকা'য় লেখা হল, 'এ রেড লেটার ডে ইন বেঙ্গলি লিটারেচার'। প্রবল হাততালির মধ্যে কবি মঞ্চে উঠলেন। ভীষণ ভিড়। সভাপতি সারদাচরণ মিত্র। স্বস্তিবাচনে ঠাকুরপ্রসাদ আচার্য। পরিবেশিত হল কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর লেখা গান, "বাণীবরতনয় আজি স্বাগত সভা মাঝে"। গানটি পরিচালনা করেন সঙ্গীতাচার্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ও অর্ঘ্যদান করলেন কবিকে। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আবৃত্তি করলেন কবিতা। শেষে অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন পরিষদ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

শান্তিনিকেতনে কবির জন্মদিন সাধারণত পালিত হত আম্রকুঞ্জে। ভোরের বৈতালিক ফুল-পাতা-আলপনা, উপনিষদের মন্ত্রপাঠ, সংস্কৃত শ্লোক, কবিতা-গান-নাটক – এই নিয়ে হত আয়োজন।

তখন কবির বয়স সাতান্ন। জন্মদিন পালিত হল জোড়াসাঁকোয়। স্থান, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা। আয়োজক, কবির নাতি-নাতনী-নাতবৌ। নান্দীমুখে দুটি গান পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পড়লেন কবিতা। গান শোনালেন সুপ্রভা রায়, রমা দেবী ও অজিত চক্রবর্তী। পরিবেশিত হয়েছিল বর্ষার গান। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সভায় নিমন্ত্রিত ছিলেন। সভার শেষে আচমকা কবি নিজেই গেয়ে উঠলেন 'তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলে'। ভার হয়ে গেল জন্মদিনের উৎসব। রাত্রের খাবারের আয়োজন 'বিচিত্রা' বাড়িতে। তারপর গভীর রাত পর্যন্ত গানের আসর।

জন্মদিনে কবি অনেক সময় বিদেশেও ছিলেন। ষাট বছর বয়সে ছিলেন জেনেভায়। তেষট্টিতে বেজিঙে (তখন নাম ছিল পিকিং)। সেখানে 'ক্রেসেন্ট মুন সোসাইটি'তে কবিকে উপাধি দেওয়া হয় 'চু-চেন-তাং' (ভারতের মেঘমন্দ্রিত প্রভাত)। আটষট্টিতম জন্মদিনে কবি সমুদ্রে ভাসছেন 'তোসামারু' জাহাজে। আমেরিকা থেকে জাপানের পথে। আর প্যারিসে ভারতীয় সমিতির উদ্যোগে পালিত হয় উনসত্তরতম জন্মদিন।

প্রথম বৃক্ষরোপণ উৎসবের সূচনা হয়েছিল কবির চৌষট্টি বছরের জন্মদিনে। পঁচিশে বৈশাখ ১৩৩২। উত্তরায়ণের উত্তরদিকে রাস্তার দিকে পঞ্চবটি প্রতিষ্ঠিত হল। গাওয়া হল গান। 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও'। সন্ধ্যার পরিবেশন 'নটীর পূজা'।

কবির সত্তর বছরের জন্মদিন ছিল সবচেয়ে বেশি সমারোহপূর্ণ। শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে বিধুশেখর শাস্ত্রী সংস্কৃত ভাষায় স্বরচিত কবিতা পাঠ, ক্ষিতিমোহন সেনের অথর্ববেদ থেকে কবির আবাহন মন্ত্র উচ্চারণ ও সেই চিরস্মরণীয় গান 'তুনি আমাদের পিতা'। এরপর বৃক্ষরোপণ এবং 'প্রপা' অর্থাৎ 'জল উৎসর্গ'। কবি সহজ কথায় বলেন, '... আমি কবিমাত্র। আমি তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী, গুরু বা নেতা নই ... আমি সেই বিচিত্রের দূত'। কলকাতাতেও হয়েছিল এই সত্তর বছরের জন্মদিন। তার বিশদ বিবরণ আছে ১৯৪১ সালে প্রকাশিত ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের 'টেগোর মেমোরিয়াল সাপ্লিমেন্টে' (অমল হোম সম্পাদিত)। সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় সুনীল দাস লিখেছিলেন 'জন্মদিনের মুখর তিথি' (১৩৯৩)।

এখনও চব্বিশে বৈশাখের রাত্রিশেষে প্রথম পাখিটি ডেকে উঠলেই মনে হয়

‘বদলেছে দিন পালটেছে রাত
ইমেল মোবাইল হে প্রণিপাত
একটা সত্য অবিকৃত
লেখার খাতায় রবীন্দ্রনাথ’।

কৃতজ্ঞঃ রবিজীবনী – প্রশান্তকুমার পাল, জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ – কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ – পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ।

কবি তন্ময় চক্রবর্তী। পেয়েছেন কৃত্তিবাস, মহাশ্বেতা দেবী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পুরস্কার ও পদক। কাব্যগ্রন্থ এ পর্যন্ত ৯ টি। তারমধ্যে ‘ডোভার লেনের রাত্রি’ (সিগনেট প্রেস), ‘আমার রবিঠাকুর’ (প্রতিভাস) বিদগ্ধ পাঠক মহলে সমাদৃত। দেশে ও বিদেশের নানা সাহিত্যসভায় ওনার কবিতা পাঠ বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ

বিষ্ণু দে

অশান্ত শতাব্দী ব্যেপে দিনরাত্রি বেঁধে যে সূর্যের
দীর্ঘ আয়ু, একাধারে বাঁশি ও তূর্যের
কুসুমে ও বজ্রে তীব্র যার সদা ছন্দায়িত প্রাণ,
ধ্যান যার সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তের বিধুর যার গান,
সেই তো বিশ্রামহীন মধ্যাহ্নের কর্মিষ্ঠ রৌদ্রের
প্রাবল্যে চেয়েছে ফল-ফুল আর আউষ-আমন
যেখানে সবার হতে অধম ও সর্বহারা দীন,
চেয়েছে যে প্রতিদিন দেশব্যাপী সর্বতোভদ্রের
সর্বত্র সকলে হোক সচেতন সচ্ছল ও সুখী ।

হে বন্ধু, তোমরা বলো কেন তবু বলিষ্ঠ মননে
আলোকিত নিত্যকর্মে আমরাও সৌন্দর্যে স্বাধীন
সর্বদা উদ্‌গ্রীব নই, লক্ষ লক্ষ চিত্ত সুর্যমুখী ?

(“রবীন্দ্র-শতায়ন” থেকে গৃহীত)

মৌসুমী ব্যানার্জী

আমার রবীন্দ্রনাথ

আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ
স্বপ্নে পাওয়া সেই ঠাকুর
রাতবিরেতে দুখজাগানি
দেয়াল ভেঙে চুরমাচুর ।

আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ
ঘুমপাড়ানি মায়ের গান
আরো আঘাত সইবে আমার
তালিমছাড়া চরম তান ।

আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ
জুঁই'এর চারায় একফোঁটা জল
সিঙ্গল রীড হারমোনিয়াম
আতুর দিঠী ওগো অতল ।

আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ
নুন আনতে পান্তা ফুরোয়
চাওয়া পাওয়ার পথটি ধরে
ঠিক তখনই অমিত রায় ।

আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ
আকাশপ্রদীপ আঁধার রাতে
ছোট্ট বামী ইচ্ছে হয়ে
আমার ঘরে এক প্রভাতে ।

আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ
গোল চশমা কুর্চি হার
ছড়িহাতে উজানবাবু
টেডিছানার কানাইমাষ্টার ।

আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ
আশি পেরিয়ে নড়বড়ে মা
সব ভুলেছেন, তবু থাকে
এই যে ধুলা আমার না।

আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ
দিনের শেষে তোমার ফেরা
বি আমার মধুকরী
ঘুম নামছে ছায়ায় ঘেরা।

আমেরিকা ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের বায়োস্টাটিস্টিক্সের অধ্যাপক **ডঃ মৌসুমী ব্যানার্জী**, গবেষণার বিষয়বস্তু অঙ্ক দিয়ে অনকোলজি-র সমাধান। জন্ম কলকাতায়, লেখাপড়া কলকাতার পাঠভবন স্কুলে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট এবং পরবর্তীকালে ডক্টরেট উপাধি আমেরিকার উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কর্মসূত্রে বিশ্বনাগরিক। পেশাগতভাবে মৌসুমীর বাস ঘোর বিজ্ঞানের জগতে। বিজ্ঞান ওঁকে দেয় ইন্টেলেকচুয়াল স্টিমুলেশন, কিন্তু সাহিত্য সংগীত মৌসুমীর কাছে ঘরে ফেরা, জ্বরের মাথায় মায়ের হাতের জলপট্টি, পরম নির্ভরতা। লেখালেখির শুরু কলেজ জীবন থেকেই। মৌসুমীর কবিতায় নাগরিক একাকীত্ব এবং জীবনের সঙ্গে জীবন সম্পৃক্ত করে বাঁচা, পাশাপাশি রয়েছে অপলক মুগ্ধতায়। বাড়ি বদলে গেছে, দেশ বদলে গেছে, তবু মৌসুমীর কবিতায় আজও সেই সুরকিখসা দেয়ালের গায়ে টিকটিকি আটকে থাকা মুহূর্তের অপাপবিদ্ধ ছবি।

সঞ্জয় চক্রবর্তী

রবি বন্দনায়

মেঘের থেকে মেঘের বুকে ধূসর,
ধূসর থেকে ধূসর হল প্রাণ,
প্রাণের থেকে প্রাণে মাঝে সুর,
বুকের মাঝে আজও গীতবিতান,

মানুষ থেকে মানুষ বাড়ায় ভীড়,
ভীড়ের থেকে ভীড়ে হারায় মুখ,
মুখের থেকে মুখে আসে মুখোশ,
মুখোশিয়ানায় লুকিয়ে থাকে দুখ,

লতার থেকে পাতায় মোড়ে জীবন,
প্রহর থেকে প্রহর কাটে রাত,
রাতের থেকে রাতে জাগে প্রদীপ,
বুকের মাঝে আজও রবীন্দ্রনাথ,

তোমার সুরে নিঃস্ব করো গ্লানি,
আগুন পুড়ে দর্প করো ছাই,
কাঙ্গাল করো এক জীবনের মোহ,
নতুন দিনে নতুন হতে চাই ।

সঞ্জয় চক্রবর্তী অধুনা সিডনী নিবাসী । পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক । ছন্দ তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে । ফেসবুকিয় জগতে অনেক দিন ধরে টুকিটাকি লেখার পর অবশেষে বাতায়নে আত্মপ্রকাশ । সঞ্জয়ের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল মেঘ আর বৃষ্টি ।

মনীষা বোস

আমার প্রিয় রবিঠাকুরের কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুমুখী প্রতিভা সর্বজন বিদিত। ছোটো গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা যখন যেটা লিখেছেন সেটাতেই প্রকাশ পেয়েছে রবিঠাকুরের সুদূর প্রসারী কল্পনা, লেখার মুন্সীয়ানা, বিষয় বস্তুর আর ভাবের বৈচিত্র্য। ভেবে অবাক হই এতো এতো গান, কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ কি করে লেখা সম্ভব একটা জীবনে। এই বিরাট সৃষ্টির পেছনে কবির কত যে অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা আর পরিশ্রম রয়েছে তা ভেবে বিস্মিত হই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিপুল কালজয়ী সাহিত্য সম্ভার সময়ের বাধা না মেনে সাবলীল গতিতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। কবি গুরুর বেশ কয়েকটা কবিতা আমাকে আমার দৈনন্দিন সকল কাজের প্রেরণা দিয়ে আসছে। জীবনের চলার পথে ভুল ভ্রান্তির গোলক ধাঁধায় যদি কখনো পথ হারাই তখন এই কবিতাগুলিই ধ্রুবতারার মতো আমাকে সঠিক পথের নির্দেশ দেয়। চাওয়া আর পাওয়ার হিসেব করতে বসে যদি দেখি না পাওয়ার পাল্লাটাই বেশী ভারী তখন রবিঠাকুরের কবিতাই আমাকে দুঃখের সাগরে ডুব দিয়ে সুখের মণি মুক্তো তুলে আনতে সাহায্য করে।

যদিও আমার জন্মের অনেক বছর আগে কবিগুরু এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তবু ওনার লেখা এখনও কিভাবে আমাকে প্রভাবিত করে সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আমার এই লেখাটা। একান্তই আমার নিজস্ব পছন্দের ছোটোবেলায় শোনা রবিঠাকুরের 'শিশু' আর 'শিশু ভোলানাথ' কাব্য গ্রন্থের দুটো কবিতা কিভাবে আমার মনে রেখাপাত করেছে তাই নিয়ে লিখছি এখানে। সুদূর কোন অতীতে শোনা এই কবিতা দুটো আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে কিভাবে চিরস্থায়ী এক দাগ রেখে গেছে সেই কথাই আজ আমার লেখার বিষয়।

খুব ছোটোবেলায় মা 'শিশু ভোলানাথ' আর 'শিশু'-র কবিতা পড়ে শোনাতেন। তখন ঠিক আমার কবিতা বোঝার বয়েস হয়নি তবু মনে আছে শুনতে খুব ভালো লাগতো। কিন্তু স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় সেইসব কবিতা বিস্মৃতির কোন অতলে হারিয়ে গিয়েছিল। লিখতে যদিও লজ্জা করছে তবু স্বীকার করতেই হবে সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথের কবিতার থেকে ছোটো গল্প পড়তেই বেশী ভালো লাগত। কবিগুরুর কবিতা পড়ার চেষ্টা যে করিনি তা নয় তবে ভীষণ শক্ত লাগত। এখন বুঝতে পারি রবীন্দ্র কবিতার অর্থ বোঝার মতো পরিণত মন সেই বয়সে ছিলনা। তবে আমি যখন কলেজে পড়ি তখন আমার দিদির মেয়ে হওয়ার পর মা একটা গান শুনিয়ে ওকে ঘুম পাড়াতেন। গানটা শুনলেই মনের মধ্যে একটা অনুরণন উঠত। মনে হতো কবে কোথায় যেন আমি শুনেছি গানটা। বিস্মৃতির আড়াল থেকে মনের মধ্যে তিরতির করে কাঁপত ভুলে যাওয়া কিছু কথা। একদিন মাকে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছিলাম ওটা আসলে ঠিক গান নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিশু' কবিতা গ্রন্থের 'পরিচয়' কবিতাটা মা গানের সুরে ওকে শুনিয়ে ঘুম পাড়াতেন। মা'র কাছেই শুনেছিলাম এইভাবেই গানের সুরে কবিতাটি শুনিয়ে মা আমাকেও ঘুম পাড়াতেন। শুনে বুঝতে পেরেছিলাম কেন –

''একটি মেয়ে আছে জানি, পল্লীটি তার দখলে –
সবাই তারে পুজো জোগায়, লক্ষ্মী বলে সকলে''

শুনলেই আমার চেতনার গভীরে আলোড়ন ওঠে। কেনই বা মনে হয় অনেক দূরের পথ বেয়ে ভুলে যাওয়া কোনো কথা ও সুর আমার মনের দরজায় বার বার ধাক্কা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। সেই থেকেই আবার শুরু হলো রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ার। চোখের সামনে নতুন এক জগৎ খুলে গিয়েছিল। একে একে পড়তে আরম্ভ করলাম 'শ্যামলী', 'পূরবী', 'মানসী' প্রভূত সব কবিতার বই। মা'র কাছে ছোটবেলায় শোনা 'শিশু ভোলানাথ' আর 'শিশু'-র কবিতা আবার নতুন সুরে আমাকে ধরা দিল। মনে আছে একদিন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে আমি একা ঘরে বসে 'মনে পড়া' কবিতাটা পড়ছিলাম।

পড়তে পড়তে চোখ জলে ভরে গিয়েছিল । ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলাম । মা তখন সন্ধ্যা প্রদীপ দিচ্ছিলেন । আমার মাথায় হাত দিয়ে মা হেসে বলেছিলেন বোকা মেয়ে ওটা তো কবিতা । কবিতা পড়ে কি কেও কাঁদে ? আমি তো এখানেই আছি । কিন্তু শুধু কি সেই অল্পবয়সে ? এখনও তো যখনই পড়ি –

মাকে আমার পড়ে না মনে ।
শুধু যখন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলিবনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে
তখন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে ?

চোখ জলে ভরে যায়, এক অসহনীয় ব্যথা মনের গভীরে তোলপাড় তোলে । ভুলিয়ে দিয়ে আমার বর্তমান আমাকে নিয়ে যায় 'দূরদেশী' সেই কোন অতীতে । সত্যি বলতে কি কবিতাটা এখন যেন আরও বেশী অর্থবহ । আরও বেশী সত্য । মা সত্যি এখন অনেক অনেক দূরে । আকাশের তারা হয়ে হয়তো আমকে দেখছেন । আমি হাত বাড়িয়ে আর কোন দিনই মাকে জড়িয়ে ধরতে পারবনা । হারিয়ে যাওয়া হঠাৎ কোন গন্ধে অনেক সময় সত্যি সত্যিই মাকে যেন আবার ফিরে পাই । হয়ত অল্পবয়সে মা হারানো কবি নিজের মনের কথাই লিখেছিলেন এই কবিতাটিতে । তবু মনে হয় এ যেন কবির সুদূর প্রসারী চিন্তাধারার প্রতিফলন যা আমার বা আমাদের সবার মনের কথা । যে ভাব, কথা কখনো পুরনো হয়না ।

যাইহোক, 'পরিচয়' কবিতাটিতে আবার ফিরে আসি । নিজের ছেলেমেয়েদের ও ঘুম পাড়িয়েছি সুর করে সেই 'পরিচয়' কবিতাটা শুনিয়ে । আজ জীবনের অনেক অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি । নাতি নিকোবাবু আর নাতনি খুকুমণিকেও কবিতাটা শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়েছি । অবশ্য নিকোবাবু বরাবর-ই শান্ত ছেলে । গান শোনার আগেই প্রায় ঘুম পরী এসে বসত ওর চোখে । কিন্তু বিচ্ছু খুকুমণিকে ঘুম পাড়াবার সময় সত্যিই খুব কাজে দিয়েছিল এই কবিতাটা । যতই ঘুম পাড়ানি 'মাসি পিসীর' গান শোনাইনা কেন মেয়ে কিছুতেই ঘুমোতোনা যতক্ষণ না সুর করে শোনাতাম –

''একটি মেয়ে আছে জানি, পল্লীটি তার দখলে –
সবাই তারে পুজো জোগায়, লক্ষ্মী বলে সকলে ।
আমি কিন্তু বলি তোমায় কথায় যদি মন দেহ,
খুব যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে আছে আমার সন্দেহ ।''

কবিতাটা শোনার সাথে সাথেই দুষ্টু মেয়ের চোখ আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যেত । তাই খুকুমণির যখন একমাস বয়েস তখন আমি শিকাগো ফিরে আসার আগে আমার ছেলের বৌ মেগান ছেলে জয়কে বলেছিল এটা রেকর্ড করে রাখতে । ও ঘুম পাড়াবার সময় খুকুমণিকে শোনাবে । যদিও বুঝতে পারে না তবু মেগানেরও শুনতে খুব ভালো লাগত কবিতাটা । প্রসঙ্গত বলে রাখি মেগান কিন্তু বাঙালী না, ও হোলো কংকানিজ । আমার মনে হয় এখানেই রবি ঠাকুরের লেখার সর্বজনীন কালজয়ী প্রভাব । যার বিস্তার কখনও সময়, ভাষা বা বয়সের বাধা মানেনা । নদীর স্রোতের মতো যা এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলে ।

এখানেই রবিঠাকুরের জিৎ । আমাদের জন্মের অনেক বছর আগেই উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন । কিন্তু সত্যিই কি চলে গেছেন ? এখনো কবিতা, গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের মনের মধ্যে রবিঠাকুরের অস্তিত্ব উজ্জ্বল এক নক্ষত্রের মতো সর্বদা বিরাজমান নয় কি ?

কবির ভাষায় —

মিলিয়েছিলেম বিশ্ব-ডালায়
তোমার ফুলে আমার মালায়,
সাজিয়েছিলেম ঋতুর তরণীতে,
আশা আমার আছে মনে
বকুল কেয়া শিউলি সনে
ফিরে ফিরে আসবে ধরণীতে ।

আম্রকুঞ্জ

In the shadows of her trees we meet
in the freedom of her open sky.
Our dreams are rocked in her arms.

— Rabindranath Tagore

রবিরশ্মি ঘোষ

তস্কর

নিশুতি রাতের নিঃঝুম আঁধারে ঘুমায় মেবার বাসী,
জাগরণে শুধু রানী মধুলিকা আর জাগে তার দাসী।
অলিন্দে বসি দেখিতেছিলা সে দুর্গ প্রাকার পানে,
নিদ্রাবিহীন চক্ষু মেলিয়া মধুলিকা আনমনে।
অদ্য রজনী শেষের রজনী ভাবিতেছিলেন তিনি,
স্বামী চিতা মাঝে হইতে হইবে স্বামীর অনুগামিনী।
এক ঠায়ে বসি দেখিতে দেখিতে আসে তন্দ্রার ঘোর,
সহসা চমকি দেখিলা চাহিয়া কে যেন খুলিছে দোর।
প্রথমে ভাবিলা হইবে বুঝি বা এ তার মনের ভ্রম,
করিছে বুঝি বা চিত্ত বিকল জাগিয়া থাকার শ্রম।
পরমুহূর্তে চাহিয়া দুয়ারে ঘুছি গেল সেই ভ্রম,
কৃষ্ণ বসনে দাঁড়ায়ে সেথায় যেন সাক্ষাৎ যম।
দীর্ঘ আকার ভীষণ প্রকার কালো উষ্ণীষ মাথে,
হাতে তরবারি আরো সারি সারি অস্ত্র তাহার সাথে।
কাঁপিয়া উঠিয়া ভাবিলা রানীমা আসিছে স্বয়ং যম,
সতী হইবার পূর্বেই বুঝি রুধিবে কালের ক্রম।
নিজ স্থান হতে উঠিতে না পারি সভয়ে কহিলা রানী,
“অন্তঃপুরেতে কেমনে পশিলে বল হে খড়্গপাণি?
কি সাধন বলে প্রহরী সকলে করিয়াছ তুমি বশ?
তুমি কি মানব নাকি তুমি কোন দানব বা রাক্ষস?”
প্রশ্ন শুনিয়া হাসির রেখাটি খেলি গেল তার মুখে,
ধীর পায়ে আসি বসিল সে বীর ভূমিতে রানীর সুমুখে।
ভূমির পরে রাখি তরবারি কহিলা মন্দ্রস্বরে,
“কহিলে কিছু পুরাতন কথা চিনিতে পারিবে মোরে।

তস্কর মোরে কহিয়া ছিলে বহুকাল আগে তুমি,
তারই শোধ নিতে আসিয়াছি আজি বহুদূর হতে আমি।”

এই কথা শুনি চমকি উঠিলা সহসা রাজার ঘরণী,
ধুলি ধুসরিত পুরাতন স্মৃতি উঠিল আবার ধ্বনি।
তখন সদ্য কিশোরী বেলার রঙিন স্বপ্ন চোখে,
ঝুলনের দিনে দেখিয়াছিলেন তাহারে সবার অলখে।
সে ছিল এক দামাল কিশোর পাহাড়ি ভীলের বংশ,
তরবারী হাতে লাগিত যেন সে কার্তিকেয়ের অংশ।
এক ঝর্ণার ধারে সেদিন হইল চারি চক্ষুতে চাওয়া,
কিশোরী হৃদয়ে কম্পন জাগে কেমনে যাইবে পাওয়া।
তাহার পরে কাটিয়া গেল আরো মাস কতিপয়,
সেদিনের কথা রাজকুমারীর মনের ভিতর রয়।

ইত্যবসরে হইল রটনা নগরবাসীর মুখে,
অদ্ভুত এক তস্কর নাকি করিতেছে চুরি সুখে।
ধরিতে তাহারে ব্যর্থ হয়েছে নগররক্ষী গণ,
বিমূঢ় করিবে সহজে সবারে এ যেন তাহার পণ।
সেদিন ও আছিল এমনি রাত এক মারবার রাজপুরে,
মধুলিকা ছিলা নিদ্রা গামিনী একাকী অন্তঃপুরে।
হঠাৎ জাগিয়া চমকি দেখিলা কৃষ্ণ বসনে ঢাকি,
দাঁড়ায়ে কে যেন শয্যার পাশে জ্বলিতেছে তার আঁখি।
সভয়ে উঠিলা চীৎকার করি “তস্কর তস্কর”,
প্রহরী সকলে নিমেষে হাজির অতিশয় তৎপর।
ক্ষণিকের তরে মুখ হতে গেল কৃষ্ণ বসন সরি,
রাজকুমারীর চিত্ত কাঁপিল হঠাৎ আনন হেরি।
কিশোরী হৃদয় দিয়াছিলা যারে সে কি তবে তস্কর,

সে কথা ভাবি রাজকুমারীর হৃদ মাঝে মর্মর।
প্রহরী সকলে করিয়া বিমূঢ় গিয়াছিল যে চলিয়া,
বিমূঢ় হইলা মধুলিকা আজ আবার তাহারে হেরিয়া।

হাসিয়া মৃদু কহিল রতন
"খুঁজিতে তোমারে করেছি যতন,
পাইয়াছি আজ না পাওয়ার ধন
লইব হরিয়া তাহারে এখন।"

অপলকে চাহি মধুলিকা কহে
"অনেক সময় গিয়াছে বিরহে,
এ বেদনা আজি আর যে না সহে
তস্কর মোর আমারে হর হে।"

সিডনি তে কর্মরত **রবিরশ্মি ঘোষ** এর লেখার জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ ইংরেজি তে লেখা উপন্যাস "দ্য গডস অফ সুমেরু" দিয়ে। তারপর শুরু হয় বাংলায় কবিতা, গান, ছোটগল্প ও নাটক লেখা। লেখার বিষয় হিসাবে বিশেষ ভাবে পছন্দ ঐতিহাসিক এবং পৌরানিক পটভূমিকায় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক । কবিতা লেখায় বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা চালাতে আগ্রহী এবং কবিতার মাধ্যমে গল্প বলতে তার বিশেষ পছন্দ অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

তপনজোতি মিত্র

ভুবনডাঙ্গার কবি

কোন এক বিষণ্ন স্তব্ধতার বিকেলে,
যখন অরণ্য ঝরিয়ে ফেলছে তার অরুণ রাঙা পাতাগুলি,
যখন শীতল হাওয়া আর ঘন কুয়াশায় ভরে যাচ্ছে জীবনের চতুর্দিক,
যখন গোধূলিবেলার গাঢ় বিষণ্নতার ভেতর দিয়ে ঘরে ফিরছে ভাঙ্গাচোরা মানুষ

এরকম এক মুহূর্তে

তোমার সব ঐশ্বর্য নিয়ে,
তোমার ভুবনডাঙ্গার মাঠ নিয়ে,
তোমার অমলিন জ্যোৎস্না নিয়ে,
তোমার পৃথিবীময় দৃষ্টি নিয়ে,
তোমার আকাশভরা হৃদয় নিয়ে,
তোমার নীল দিগন্তের বসন্ত নিয়ে,
তোমার অরুণ আলোর আবেগ নিয়ে,
তুমি এই করুণাঘন পৃথিবীতে সৃষ্টি কর জীবনের অসীম উজ্জ্বল আলোকবিন্দুগুলি

তোমার চেতনার রঙ আমাদেরকে রাঙিয়ে দিয়েছে
এই সূর্যাভ পৃথিবী,
এই অপরূপ আলোকমগ্নতা,
এই মহাদ্যুতিময় সমাজ

এক বিস্তীর্ণ পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে তুমি তখন চোখ মেলে থাক
অনুপম সেই ভুবনডাঙ্গার দিকে,
পূর্বাচলের দিকে,
তোমার মানুষের দিকে

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু-এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। একটি গল্প 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি' দখিনা পত্রিকায় প্রকাশিত। কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্প করতে ভালবাসেন। এবং কখনো নাটকে অভিনয়, কখনো বা দেশ ভ্রমণ।

মানস ঘোষ

জাতীয়তাবাদ – রবির আলোয়

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে, ১৯১৯ সালে নোবেলজয়ী ফরাসী দার্শনিক রম্যাঁ রল্যাঁ, সমগ্র বিশ্বের যুদ্ধ ও উগ্র জাতীয়তাবাদবিরোধী শিল্পী সাহিত্যিকদের হয়ে একটি যৌথ বিবৃতি তৈরি করেন। সেটি বিভিন্ন দেশের বরেণ্য শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কাছে স্বাক্ষর করার জন্যে পাঠানো হয়। তাতে স্বাক্ষর করার সঙ্গেসঙ্গেই রল্যাঁকে দেওয়া একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন – "... The truths that save us, have always uttered by the few and rejected by the many and triumphed through failures."

আধুনিক বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাবিদরা বলে থাকেন, ঠিক ভুল, ভালো মন্দ'র মতো সত্যও নাকি আপেক্ষিক। অবিমিশ্র ভালো, ডাহা মিথ্যে বা পরম সত্য বলে নাকি কিছু হয়না। আমরা তর্কপ্রিয় বাঙালী জাতিও মোটামুটিভাবে সেই মতের অনুসারী। তাই রবীন্দ্রনাথকেও আমরা ঐশ্বরিক মহিমাপ্রদানে ভারাক্রান্ত না করে, ফুল বেলপাতার আড়াল থেকে, দোষ-গুণ সমন্বিত রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলাম। চুলচেরা বিচার করার চেষ্টাও কিছু কম করিনি। কিন্তু দিনের শেষে দেখা গেল, আপেক্ষিকতার সব আধুনিক হিসেব উলটে দিয়ে তাঁর গানে, কবিতায়, গল্পে যেন নিখুঁতভাবে বিধৃত আছে আমাদের মনোজগতের যাবতীয় রহস্যময় কারিকুরি, প্রবন্ধের বক্তব্য যেন যুগকাল পেরিয়েও একইরকম প্রাসঙ্গিক আর যথাযথ। তাঁর যুক্তিবিস্তারের হাত ধরে আমরা অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারি, সুনির্দিষ্ট সত্যের খুব কাছাকাছি। 'দিনের শেষে' কথাটি তাই নেহাতই প্রতীকী, 'যুগ' বা 'শতাব্দী পার করে'ও লেখা যেত।

একশ বছর বা তারও আগে বলা তাঁর কথাগুলি আজও সমান প্রাসঙ্গিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্মরণ করা খুব জরুরী বলে মনে হয়। আজ যখন ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন করে জাতীয়তাবাদের নানারূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি, সে সময় উগ্র জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবতেন, আসুন একটু দেখে নেওয়া যাক।

জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজম কথাটি বহুলপ্রচলিত হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপীয় রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষিতে। ইমানুয়েল কান্ট, গটফ্রিড হার্ডার প্রমুখ দার্শনিকদের মতামতকে সংক্ষেপিত ও সংজ্ঞায়িত করলে বলা যায় যে, মানুষের গোষ্ঠীভিত্তিক আত্মস্বাতন্ত্রবোধের ইচ্ছাশক্তিই জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপাদান হিসেবে প্রতীয়মান হল, 'অপর' বা অন্যপক্ষের ধারণা। এই গোষ্ঠী গড়ে ওঠার ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তি হতে পারে, যেমন ভাষা বা সংস্কৃতিগত মিল, ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহ্য অথবা একই নেশন-স্টেট বা রাষ্ট্রের পরিসরে থাকা। এই শেষোক্তটিকে নিয়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের ভয়ানক অনীহা। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'নেশন স্টেটের ধারণা দাঁড়িয়ে থাকে একধরনের সংঘবদ্ধ স্বার্থপরতার ওপর, যা কখনোই মানব সভ্যতার আদর্শ হতে পারে না। জাতীয় গর্ববোধ দিয়ে শুরু হয়ে নেশন-স্টেট শেষপর্যন্ত জাতিগত বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ও হানাহানিতে পর্যবসিত হয়।'

স্বাধীন জাতি বা রাষ্ট্রসমূহের জাতীয়তাবাদ নিয়ে 'Nationalism' নামের বক্তৃতামালায় রবীন্দ্রনাথ জাপান এবং আমেরিকায় যা বলেছিলেন, ইতিহাসের আলোয় তার প্রেক্ষিত বিচার করতে বসলে প্রথমেই অবাক হতে হয় তাঁর অতুলনীয় নৈতিক সাহসের কথা ভাবলে। দুদেশেরই রাজনৈতিক এবং তথাকথিত জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্বদের একটা বড় অংশ রুষ্ট হয়েছিলেন তাঁর বক্তব্যে। ১৯১৬ সালে কবি যখন জাপানে যুদ্ধবিরোধী, উগ্র জাতীয়তাবাদবিরোধী বক্তব্য রাখছেন, তখন সেদেশে যুদ্ধোন্মাদনা আর জাতীয় অস্মিতার জোয়ার চলছে। তার ঠিক আগের বছরই জাপান চীন আক্রমণ করে খানিকটা অংশ ছিনিয়ে নিয়েছে, ১৯১০ সালে কোরিয়া আর ১৯০৫ সালে রাশিয়াকে পরাজিত করেছে। জাপানী বুদ্ধিজীবীরা তাঁর

বক্তৃতার সমালোচনায় লিখলেন, "... the Indian poet represented a defeated nation ..."। তার অভিঘাতেই কবি রচনা করলেন ইংরাজি কবিতা, "The Song of the Defeated".

সে বছরই আমেরিকায় তাঁর প্রথম বক্তৃতা, "The Cult of Nationalism" সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এখানেও ছিল কিছু অপ্রিয় কথা, 'পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদের উৎসমূলে এবং কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সংঘাত ও জয়ের প্রবল ইচ্ছা, সামাজিক সহযোগিতা এর ভিত্তি নয়।' এছাড়াও ইঙ্গিত দিলেন যে, পাশ্চাত্যের সুসংবদ্ধ সংগঠন নির্ভরতার চাপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও সৃষ্টিশীলতার ধারা ক্রমক্ষীয়মাণ হওয়ার আশঙ্কা আছে। সর্বত্রই তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল, পারস্পরিক সহযোগিতায় গড়ে ওঠা সমাজ, ব্যক্তিসত্তা অক্ষুণ্ন রেখে মানবিক উৎকর্ষের অনুশীলন ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে পারলেই মানবজাতির মঙ্গল, জাতীয়তাবাদের আস্ফালনে তা ব্যাহত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া থেকে শুরু করে নাইট উপাধি ত্যাগ, সবেতেই রবীন্দ্রনাথের নির্ভীক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যায়। দেশবাসীকে উজ্জীবিত করার জন্য লিখেছিলেন বহু দেশাত্মবোধক গান। অথচ তাঁর ঘরে বাইরে (১৯১৬) উপন্যাসে নিখিলেশ যখন বলে, 'দেশের সেবা করতে রাজী, কিন্তু দেশকে সবকিছুর ওপরে বসিয়ে বন্দনা করতে থাকলে দেশেরই সর্বনাশ হবে', – স্বদেশেই রবীন্দ্রনাথকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। এর জবাবে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিলেন দেশকে সত্যিকারের ভালোবাসেন বলেই তিনি প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন। তার জন্যে দুঃখ পেতে হলেও সান্ত্বনা থাকবে যে লোকপ্রিয় হওয়ার জন্য মিথ্যাচরণ করেননি। এই উপন্যাসের মাধ্যমেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি ভাবালুতায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে চালিত করার আড়ালে রাজনৈতিক নেতাদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি বা দুর্নীতির সম্ভাবনাও থেকে যায়। যদিও সে সময়ের সাধারণ মানুষের মতই বেশিরভাগ জননেতাদের নৈতিক মূল্যবোধ এখনকার তুলনায় অনেকটাই উন্নত ছিল, কিন্তু শতাব্দীর ব্যবধানে বুঝতে পারি, এ সাবধানবানী অহেতুক ছিলনা।

উগ্র জাতীয়তাবাদ পরিহার করে জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে মানুষে মানুষে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক আর সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজের উন্নতির কথাই রবীন্দ্রনাথ বলে এসেছেন। ভারততীর্থ কবিতায় লিখেছেন,

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান . . .
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, করে অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে . . .
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

কোনো সন্দেহ নেই, এই কবিতা আজকের দিনে প্রকাশিত হলে কবিকে প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হতো।

১৯১৬ সালের ১১ই অক্টোবর তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন,

"... শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র করে তুলতে হবে – ঐখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার

কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে, স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে, – ভবিষ্যতের জন্যে যে সর্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ওই বোলপুরের প্রান্তেই হবে।" – এই পরিকল্পনা থেকে বোঝা যায়, বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ কতটা আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, সমগ্র মানবজাতি সংস্কৃতি বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের আদানপ্রদানে পরস্পরকে সমৃদ্ধ করবে। মানবতা, নৈতিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূলকথাগুলি বিস্মৃত না হয়ে গড়ে তুলবে এক দ্বেষহীন সমাজ।

উগ্র জাতীয়তাবাদের যে স্বরূপ সম্পর্কে তিনি আমাদের সাবধান করেছিলেন, তা তিনি নিজেই পরে প্রত্যক্ষ করেন, নাৎসী জার্মানি আর ফ্যাসিস্ত ইটালিতে। আরো পরে চীন ও জাপানের আগ্রাসী যুদ্ধের সময়েও তা দেখা যায়। ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপন হওয়াকে বোধহয় বলা চলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবিক তত্ত্বের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি।

আজকের এই হিংসা আর যুদ্ধদীর্ণ পৃথিবীতে, দেশ, সীমান্ত, জাতি, ধর্মের নামে বিভেদসৃষ্টির বিষাক্ত সময়ে তাঁর কথাগুলিই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে প্রধান শক্তি। মাঝেমাঝেই মনে হয়, সবদেশের রাষ্ট্রনেতা আর ধর্মগুরুরা যদি রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলি পড়তেন, তাহলে পৃথিবীটা হয়ত অন্যরকম হত।

---

*তথ্যসূত্র – জাতীয়তাবাদ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের Nationalism গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ) – অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ও কৃত্যপ্রিয় ঘোষ।

প্রেমে ও বিরহে, আনন্দে শোকে শেষ কথা তিনি বলে যান

সময়ের পথে সত্যদর্শী সময়ের চেয়ে আগুয়ান ...

শুভ অশুভের দ্বন্দ্বে দিশারী, দেশকালব্যাপী অবিরাম,

মৃত্যুঞ্জয়ী বিশ্বপথিক,অযুত হৃদয়ে তাঁর নাম !

– মানস ঘোষ

মানস ঘোষ। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক''। এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে।

রুবাইয়া জেসমিন (জুঁই)

বাইশে শ্রাবণ

ঘরের মধ্যে এক অতল সমুদ্র

রোজ ডুব দিই। পাপস্খালন করি।

পাশে পাশে বসি। কথা বলি।

শৈশব, কৈশোর, যৌবন।

অসহায়ের কান্না কাঁদি, আঁকড়ে ধরি

আমার আজন্মকালের ব্যথা

আমার বাইশে শ্রাবণ ....।

জয়দেব সাহা

পঁচিশে বৈশাখ

হে বৈশাখ প্রখর হও।
রৌদ্রজ্জ্বল হোক চেতনার
সমূহ আঁধার।
এ দারুণ দুঃসময়ে
অনাবৃত মৃত্যুর তান্ডবে
ঘৃণার আহুতি মাঝে
হাল ধরো, ফিরে এসো
ফিরে ফিরে এসো,
পঁচিশে বৈশাখ।
তোমার শুভ আর সুন্দরের
গানে কবিতায়
তোমার স্মৃতি তর্পণে
জগতের গ্লানি মুছে যাক।
আজ, পঁচিশে বৈশাখ।

রুবাইয়া জেসমিন (জুঁই) – জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির একটি প্রত্যন্ত গ্রাম সাপ্টাবাড়িতে জন্ম। বাংলা সাহিত্যে মাস্টার ডিগ্রি করে এখন অস্থায়ীভাবে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত আমি। তার সাথে লেখালেখি। দৈনিক কাগজ আজকাল, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, উত্তরের সারাদিনে লেখা প্রকাশিত হয় নিয়মিতভাবে, আসাম হিলস টাইম ইংরেজি সংবাদপত্রে একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ হয়। এছাড়া ''তিস্তা কন্যা পত্রিকা''র সম্পাদনা।

জয়দেব সাহা – বর্তমানে জলপাইগুড়ি গভর্ণমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ইতিমধ্যেই আনন্দবাজার ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় অনুগল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য তার প্যাশন।

অর্পিতা চ্যাটার্জী

‘পরাণসখা বন্ধু হে আমার’

প্রিয় রবি ঠাকুর, তুমি শুনেছিলাম খুব এক সাধারণ মেয়ের গল্প লিখতে বলেছিলে শরৎবাবুকে। তোমার বলে দেওয়া রাস্তায় শরৎবাবু সে গল্প লিখলে অবিশ্যি সে মেয়ে সাধারণ থাকত কিনা সে একখানা প্রশ্ন বটে। অপ্রেমের প্রতিশোধ নিতে সে বেচারাকে বিস্তর লেখাপড়া করে, বিদেশ বিভুঁইতে এসে, অত্যাধুনিক বিজ্ঞান আলোচনা সভার একজন কেউকেটা হয়ে তবে গিয়ে শেষে নিজেকে সাধারণ থেকে অসাধারণ প্রমাণ করতে হত। সে বাপু ভারী গোলমেলে আর পরিশ্রমের ব্যাপার। তার চাইতে বরং সত্যি সত্যি এক সাধারণ মেয়ের গল্প বলি শোনো। সে গল্পে তোমারও খানিক ভূমিকা আছে বটে। অবাক হলে বুঝি। তুমি যে কত জনের মাঝে নিজেকে অল্প অল্প করে মিশিয়ে দিয়েছো, সে তুমি আর কেমন করে জানবে ? সে মেয়েকে ব্যক্তিগত ভাবে তোমার চেনার কথাও নয়। সে নাহয় নাই চিনলে। গল্প বলি বরং শোনো বসে।

মনে করো সে মেয়ে তোমায় চেনে না তখনো। ইস্কুল পাঠশালে অবিশ্যি দুলে দুলে মুখস্থ করেছে “তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে ... সব গাছ ছাড়িয়ে ... উঁকি মারে আকাশে ....”, তা সেসব পড়তে গিয়ে চাঁদনি রাতে জ্যোৎস্না আর জোনাকি মেখে ভূতের মতন দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ির সামনের ঘোষালদের তালগাছটার কথাই মনে পড়েছে বাপু তার। তোমার মুখ নয়। এমনটা নয় যে সে তোমার মুখটা চিনত না। কত্তবার তোমার জন্মদিনে পাড়ার ঘরোয়া স্টেজে তোমার ছোট ছোট লেখাগুলো মুখস্থ করে উগরে দিয়ে এসেছে। তা সেসব পড়েছে বলেই বুঝি তোমায় ভালবাসা যায় ? সেসব তো সবাই তোমার জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব করে, তা সে মেয়েও মায়ের কথা শুনে বা বন্ধুদের দেখে উৎসব করেছে। তোমায় সে সত্যি করে চেনেনা তখনও।

তোমার যে একখানা ভারী সুন্দর ইস্কুল ছিল তা সে জানত। সে ইস্কুলের ছেলে মেয়েরা নাকি বড়োই পেলব। সে পেলবতা নিয়ে নাকি অনায়াসে লোকজন হাসি ঠাট্টা করত। তার সামনে সেরকম পরিস্থিতি আসেনি তাই সেসব জানত না তখনও। তারপর একদিন কি হলো জানো, তারই দুই আত্মীয় তার সামনে তোমার ওই ইস্কুল আর তার ছাত্র ছাত্রীদের কোমলতা নিয়ে ঠাট্টা করল। নিজেদের মধ্যেই করল। সে তো তখন পুঁচকে। সেই এত্তটুকুনি মেয়ে প্রথম সেইদিন সেই ঠাট্টাকে ভাল করে নিতে পারলে না। সেইদিন প্রথম তার ঠাট্টা বলতে নির্মল হাসি ছাড়াও, অশ্লীলতার কথা মনে হলো। কারো ভঙ্গিমা নকল করে ঠাট্টা করা অশ্লীল, এ কথাটা সেদিন দুম করে মেয়েটা শিখে গেল জানো। তুমি মাঝখানে রয়ে গেলে, জানতেও পারলে না তোমায় জড়িয়ে মেয়েটা বড় হতে শুরু করল। শিখে গেল, বয়সে বড় মানেই সে সর্বদা সঠিক আচরণ করছে, এমনটা নাও হতে পারে। কোনটা শিখবে আর কোনটা নয় সেটা বিচার করার দায়িত্ব তারই। কেউ শেখায়নি জানো। সে মেয়ের নিজেরই মনে হয়েছিল যে এটি ত্যাগ করার, আত্মীকরণের নয়।

তারপরতো সে দিব্যি ইস্কুলে আর বাড়িতে তোমার ছোট ছোট কবিতা পড়ে বয়সে বাড়ছিল। একদিন জানো, কি যেন এক পুণ্যফলে সে গোটা একখানা হারমোনিয়ামের মালিক হয়ে পড়ল। হারমোনিয়ামের রিড বাজাতে গেলে তখন তার বেলো অবধি হাত পৌঁছোয়না। সে রিড বাজিয়ে বাজিয়ে সারেগামা সাধত আর তার গানের দিদিমনি তার হয়ে হারমোনিয়ামের হাওয়া টেনে দিতেন। সারেগামা সাধতে তার এক্কেবারে ভালো লাগত না জানো। খালি মনে হত, পাশের বাড়ির সোমাদিদির মতন কবে সে গান গাইতে পারবে। সন্ধ্যেবেলা সে যখন এক পা ধুলো মেখে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরত, সোমাদিদি হ্যারিকেনের আলোয় হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতো, ‘এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আরেকহাতে হার ....।’ সে বাড়ি ফিরে হাত পা ধুয়ে পড়তে বসার আগে মাকে জিজ্ঞাসা করত – “মা কৃপাণ মানে কি ?”

তারপর সেও একদিন সেই গান নিজে গাইতে শিখে গেল। ততদিনে অবশ্য পুরো হারমোনিয়ামটা কব্জা করে নিয়ে গাইতে শিখেছে সে। দিদিমনিকে আর হাওয়া টেনে দিতে হয়না। তার আগে "আমরা সবাই রাজা" দিয়ে শুরু হয়েছিল। এই তো এই কদিন আগেই বুঝতে পারল সে যে, আমরা সত্যিই সবাই রাজা। সব্বাই। অথচ সেই কবে থেকে তোমার বুলি সুর করে আউড়ে চলেছে সে বোলো।

তার বাবা তাকে শিখিয়েছিল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। তাকে শেখাবে এমন কোনো ইচ্ছে থেকে হয়নি যদিও ব্যাপারটা। আচ্ছা বলি গুছিয়ে, মনে করো একটা লম্বা রাস্তা। এই ধরো আট-নয় কিলোমিটার মতন। রেলস্টেশন থেকে বাড়ি ফিরতে হবে। রাতের অন্ধকারে তারার আলোয় আর টর্চের আলোয় সাইকেল চালিয়ে। সাইকেলের সামনের রডে বাঁধা একটা ছোট্ট সিট। সেখানে বসে আছে মেয়েটা। আর তার বাবা চালাচ্ছে সাইকেল। মেয়েটা ওই অন্ধকারে সাইকেলের হ্যান্ডেল আঁকড়ে বসে মুখটা উঁচু করে আকাশের দিকে তুলে রেখেছে। মাথার ওপর দিয়ে গুড়গুড়িয়ে পিছন দিকে সরে সরে যাচ্ছে কালো কালো গাছের ছায়া ছায়া মাথা। চোখের ওপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে মিটমিটে, চকচকে কত্ত কত্ত তারা। রাতের আকাশের রং কালো নয়, বেগুনি, সেই প্রথম দেখা তার। দুপাশে ধানক্ষেত থেকে হাওয়া এসে এলোমেলো করে দিয়ে যাচ্ছে তার চুলের দুটো ঝুঁটি। তার ভীষণ ভীষণ ভালো লাগতে শুরু করেছে কেন সে জানে না। আর ঠিক তখনই, ঠিক সেই ভীষণ ভালো লাগার মুহূর্তেই তার বাবা চাপা গলায় গুনগুনিয়ে আবৃতি করতে শুরু করেছে "না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ ....।"

কতবার কতদিন এমন ভাবে বাবার গলায় সে শুনেছে তোমার লেখা সে লাইনগুলো। শিখে নিয়েছে। সে লেখার মানে বোঝার অনেক আগেই। আজো যদি কোনো একটি মুহূর্ত তাকে উপহার হিসেবে দিতে চাওয়া হয় তবে সে এই মুহূর্তটিই সে চেয়ে নেবে বিধাতার কাছে। যেখানে সে বাবার সাইকেলের সামনে বসা দুনিয়াদারি না জানা ছোট্টটি। আর তার বাবা তাকে, অটুট স্বাস্থ্য আর অটুট মনোবল সাথে করে গ্রামের ফাঁকা রাস্তায় রাতের অন্ধকারে গুনগুনিয়ে আবৃতি করতে করতে বাড়ি ফিরছে – "মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ, কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ ! উথলি যখন উঠেছে বাসনা, জগতে তখন কিসের ডর !"। আর তার মাথার ওপর দিয়ে ক্রমশঃ পিছন দিকে সরে যাচ্ছে ছায়ারা। ফুটে উঠছে তারায় ভরা পুরো আকাশটা।

আস্তে আস্তে সে বড় হচ্ছিল সে। শিখিয়ে দেওয়া গানের মানে বোঝার চেষ্টা করতো। কখনো কখনো বুঝতেও পারত হয়ত। মনে মনে মাকে বলত, ভাগ্যিস তুমি গান শেখাবার কথা ভেবেছিলে। এমনি করেই কত কত গান, পরীক্ষায় গাইতে হবে বলে, প্রতিযোগিতায় গাইতে হবে বলে, স্টেজে একা বা আরো অনেকের সাথে গাইতে হবে বলে – সে কোনো একদিন শিখেছিল। তারপর হয়ত ভুলেই যেত। কিন্তু ওই মানে বোঝার খেলা খেলতে গিয়ে সেই গান আষ্টে পৃষ্ঠে তাকে জড়িয়ে নিলো আজীবনের মতন। ভালোবাসার মানুষকে বিয়ে করল দিদি। আর তার ঠিক দেড় বছর পরে ঝড় থেমে যাবার পর দিদি যখন ক্যাসেট থেকে তাকে শোনালো – 'বন্ধু রহো, রহো সাথে', তার সেই দিদি তখন বৈধব্যের মানে বোঝে। আর তারপর থেকে জানো, তোমার ওই গানটি সে না পারে শুনতে, না পারে গাইতে।

তারপর সে অনেকটা বড় হয়ে গেছে, ততদিনে সে বাইরে গান গাওয়া আর গান শেখা ছেড়ে দিয়েছে। কারণ তখন সে তোমার গানকে ভেতরে নিতে শিখেছে। আজ তার মনে হয় তোমার কিছু কথা বাইরে বলার নয়, শোনার, আত্মস্থ করার। ভোর বেলায় বেরিয়ে সারাদিনের অজস্র অকাজের মাঝে তার কানে বাজে – "বসে আছি হে, কবে শুনিব তোমার বাণী।" বেলা বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে অনাকাঙ্খিত অপমানের বোঝা। জীবনযাপনের শর্ত পালন করতে করতে, নুয়ে পড়া মাথা সোজা করতে করতে তার মনে পড়ে বহুকাল আগে শেখা একটা গান – "সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে।" "নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়" – আজও তার প্রতিদিনের রাত্রিকালীন শেষ প্রার্থনা। সমস্ত সমর্পনের শেষে

প্রতিদিনই তার জীবনের পরমার্থ হয়ে রয়ে যায় – "কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি। তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি।"

জীবনের সার্থকতা যদি হয় পরমার্থে মিলন, আর প্রতিদিনের দৈনন্দিকতায় পরমার্থ অর্থে যদি বন্ধু হয়, যে বন্ধু তার নিঃসঙ্গতার সঙ্গী হবে, কঠিন দিনে শক্তি যোগাবে, সুখের দিনে মাটিকে মনে করিয়ে দেবে, তবে তুমি জানোনা প্রিয়, তুমি কত কত কত সাধারণীর একমাত্র পরম বন্ধু। ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার একেকটা মাইলফলকের একমাত্র সাক্ষী। দূরে ফেলে আসা জীবনের সান্ত্বনা। পড়ন্ত রোদের গোধূলি বিকেলে মনকেমনের সাথী। অনিদ্রা আর উদ্বেগের মাঝরাতে আকাঙ্খিত ঘুমপাড়ানিয়া।

তুমি বিদ্বানের গবেষণার বস্তু নও, বোদ্ধার আলোচনার বস্তু নও, শিল্পীর শিল্প নও, কারুর কিচ্ছুটি নও। কেবল অসংখ্য সাধারণের একলা ঘরের অন্ধকার সন্ধ্যার পরম বন্ধু ।

Arpita Chatterjee — Postdoctoral Research Associate, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE-68198

Indrani Mondal

On Tagore's Child Literature (in the context of The Crescent Moon)

It was our special text for Elective English in 7th grade. A collection of poems with a front cover picture of a thin sliver of waxing moon with a little child riding on it like a canoe in the darkened sea-sky. Our English lit teacher told us it was a collection of poems for children written by Rabindranath Tagore or more accurately translated by the poet himself from his various Bengali poems in Sishu and Sishu Bholanath. The book was called as you have surely guessed by now, The Crescent Moon. When writing literary appreciation about the poems in that book, I remember saying how I enjoyed the descriptive word pictures they drew but the 'deeper' meaning, that our lit teacher insisted we write about, somehow eluded me.

Since then I have always been intrigued by the fact that most of Tagore's child literature was not written for children but more about children. That is to say, they idealize child qualities of sheer innocence, clarity of vision, simplicity of enunciation, restless questioning and honest curiosity. And all this from an adult's point of view. Some scholars say this is because Tagore was deeply influenced by British Romantic poets. Remember William Wordsworth's oft-quoted,'… child is father of the man …' from his evocative yet super simplistic poem 'My heart Leaps up' or 'Rainbow'?

This is not to say Tagore didn't write any child friendly poems at all. By child friendly I mean poems which children instantly comprehend and connect with, and because of the fun and easy cadence of such poems, can instantly commit to memory as well. Think about Sahaj path, which in spite of being a beginner's manual for learning Bengali language, remains an epitome of millions of rhymes, that are so catchy and buoyant in meaning, so bright and fresh in presentation, that they sound like the pitter patter of playful children. Some ever-popular children's poetry per se by Tagore are, 'Kumor parrar gorur gari…', 'Amader choto nadi…', 'Taalgaach ek paye dariye…', also 'Mone karo jeno bidesh ghure, maake niye jacchi anek dure…'etc. Then again there are children's poems like, 'Diner alo nibhe elo, sujji gelo dube…' (from Kori o Kamal) which has Bengal's most-recited children's couplet,'…Brishti pare tapur tupur, nadeye elo baan …'. Interestingly this poem ends with an inevitable extension of vision by a poet, who is really a philosopher, bringing in glimpses of a world view which transcends a little child's periphery of vision. Thus, the poem ends with,'…Na jani kon nodir dhare, na jani kon deshe…kon chelere ghum parate ke gahiche gaan…' ideas that involve from an adult thinker's universalism.

Now turning our attention to The Crescent Moon, which was our 7th grade special text, it can surely be said that the tone and feel of almost all the poems in this collection have a wistfulness at the adult's world's loss of innocence as compared to a child's world of inherent, innocent happiness. In my copy of the book, the first poem, Home, had an illustration by Nandalal Bose, of a mom in a white sari, carrying her child on her shoulders, that I really liked, but I have to admit, the essence or ideas of certain lines that the poem start and end with, '…the sunset was hiding its last gold like a miser..' and '…young lives glad with a gladness that knows nothing of its value for the world …', while beautiful to read slipped over my juvenile sensibility.

Most poems in The Crescent Moon are replete with such lines, which are loaded with significance more appropriate for mature minds. For example, the poem Janmakatha, translated as The beginning or The Source in The Crescent Moon, abound with ideas that made sense to me only after I became a parent myself.

Other poems in The Crescent Moon, have lines like, "…I hire you with nothing …', from The Last Bargain which also comment on how the child is Nature's unspoiled gift to humans, in contrast to grown ups who are wrought with the task of making choices that can make or break them.

The Wicked Postman, The Land of Exile, The Astronomer etc. are poems that are spoken by the child. But these too have hints of notions which a young mind, that the poet eulogizes, cannot readily dwell upon. The First Jasmines bring echoes of Wordsworth's The Rainbow or My heart Leaps. Both poets voice similar sentiments, Wordsworth marvels that his heart still leaps up at the sight of a rainbow just as it did when he was a youngster. Tagore muses, a garland of fresh, fragrant jasmines enthralls him as an adult just as it did when he was a child.

My favorite poem in The Crescent moon was and still is, On the Seashore.

It was my favorite poem back then cause the word pictures would make me remember how fun and free it had been as a child, to play on the sea beach with the relentless breakers rolling in with froth and salty spray, on our summer vacations to the sea resort Puri. Years later, this poem came to me as a sharp and intensely descriptive contrast of the unfettered joy and fearless abandon of a child in its purest form, as against the stress-ridden adult world of ruthless bargain, searing responsibility and fear of future hurdles. As such for me this poem remains a marvelous ode to the simple beauty of the quintessential child vis-à-vis the hue and cry of our grownup world.

In conclusion, I have to admit, that though as a school student I was baffled by the 'inner meaning' of the poems in The Crescent Moon, the poems had a magnetic pull of detailed imagery that made me search, find and read the original Bengali poems they were translated from. The mellifluous language and natural rhymical flow of the poems stuck in my mind, making me return to them over and over again. As my personal experiences evolved, I found myself able to go beyond the linguistic, even poetic qualities of these poems, discovering new insights into their many strata of meaning. This has only reinforced my view, that reading a truly great writer's work is never a "been there, done that", kind of experience, but one that slowly and surely reveals hidden treasures that enlighten and enrich our psyche in new ways, as we encounter them at various stages, in the ongoing process of living. In short, The Crescent Moon when read by a child appeals in one way but when assessed by an adult, amazes with its wealth of philosophical truths. When Tagore's children's literature has the charisma to draw us in different ways, for different reasons, at different times, we can gladly give them pride of place in the treasure house of his collected literary works.

Indrani Mondal studied in Calcutta and Jadavpur Universities, India, and holds a PhD in Philosophy and Social Studies. A freelance writer in both English and Bengali, over the last decade Indrani has written fiction, nonfiction and poetry mainly on social and cultural issues facing immigrants and has published three books of poetry "Fugitive Wings", "Pratidin Sati Hoi" and "Raater Sarir". She is an active member of the Chicago Creative Circle, Unmesh and is the current coeditor of a bilingual online newsletter.

শাশ্বতী বসু

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা

আমার কিশোরী কন্যার দুটি কিডনির অবস্থাই দ্রুত অবনতির দিকে। অপারেশন দরকার। আমার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি .....

ইতি রথীন্দ্রনাথ স্যান্যাল। কুসুমপুর। মো: ৯৬৮৭৪৫৩৫০০ ।

বিজ্ঞাপনটির দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে পলাশবরণ দ্রুত অন্য সংবাদের দিকে সরে আসেন।

জুলাইয়ের নির্মেঘ শীতের সকাল। দক্ষিণ গোলার্ধের ব্যস্ত শহরগুলির থেকে একটু দূরে এই উপনগরী। পরপর কয়েকদিনের কুয়াশাভরা ক্লান্ত বিষণ্ন সকাল থেকে আজ আবার আকাশ উজ্জ্বল করে সোনালী রোদ উঠেছে। সপ্তাহান্তের ছুটির দিন আজ। আয়েশ করে ব্যালকনিতে সোফার ওপর বসে আজকের বাংলা কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলেন ড: পলাশবরণ সেন ।এ অঞ্চলের স্বনামধন্য চিকিৎসক।

..... এই হয়েছে টাকা কামানোর আর এক ফিকির ..... যত্তসব ভিখিরির দল .... ।

আবার গ্রামের নামটিও উল্লেখ করা হয়েছে..... কুসুমপুর.... । কুসুমপুর..... কুসুমপুর..... হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠেন পলাশবরণ। ..... রথীন্দ্রনাথ স্যান্যাল .... কুসুমপুর .... । এ কুসুমপুর কি তার নিজের কুসুমপুর? সেই ছোট্ট শহরতলী ..... ছবির মত সুন্দর .... ছড়ানো ছিটনো জায়গা নিয়ে নিয়ে বাড়ীঘর .... দাদু দিদা ঠাম্মা জেঠু কাকু কাকিমা আর দাদা দিদি ঝন্টু মন্টুদের বাড়ী। সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা, ঝকঝকে স্কুল বাড়ী হাসপাতাল আবার ধূধূ খেলার মাঠ ..... নদী, কাশবন .... দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের ক্ষেত .... ।

দূরে বহু দূরে চোখ চলে যায় তার ..... যেখানে আকাশে চিল উড়ছে একটা .... নীচের দিকে মুখ করে। ওই অতদূর থেকেও সে বোধহয় স্পস্ট দেখতে পাচ্ছে নীচের জিনিষ .... ওই তো আট বছরের ছোট্ট পলু যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে ..... হাতে সেন কাকুর দোকানের সদ্য আভেন থেকে বেক করা কেকের বাদামি কাগজের ঠোঙা ..... বাবার সাথে পলু গেছিল সেন কাকুর কেকের দোকানে। ছোড়দি কেক খেতে চেয়েছিল কিনা। কেক নিয়ে ফিরছিল সে একা। বাবা ফিরে গেছিল তার কাজে। ওর হাতের সেই ঠোঙাটা আকাশের অনেক ওপর থেকে চিলটা দেখতে পেয়ে ছোঁ মেরে এসে নিয়ে গেছিল হঠাৎ। ভ্যা করে কেঁদে ফেললো সে। তারপর ফিরলো হাত কেটে চিলের ধারালো ঠোঁটের কামড়ে এবং বলাই বাহুল্য কেক ছাড়া। কি করে ওতদূর থেকে চিলগুলো টের পায় যে এটা পলু .... রোগা প্যাংলা পলু ..... ডিসপেপসিয়াতে ভোগা আর কথায় কথায় কাঁদা পলু কিছুতেই বুঝতে পারে না। কিন্তু চিলগুলো সব জানে।

পলু যখন বারান্দায় বসে হাতের লেখা লেখে বা সুখীদি যখন বারান্দার নীচে বসে পেতলের কলসী ঝকঝকে করে তখন কিন্তু চিলগুলো কিচ্ছু বলে না। কিন্তু এই যদি পলু গতরাতে বাবার আনা নলেনগুড়ের সন্দেশ দিয়ে মুড়ি খেতে বসত বা সুখীদি যদি ওখানে মাছ কাটতে বসত তবে ঠিক চিলগুলো সোঁ .... ও ..... ও করে নেমে এসে ছোঁ মেরে সব নিয়ে যেত। ওরা সব টের পায়। পেন্সিল চিবোতে চিবোতে ভাবে পলু। ভাবা তার একটা অসুখ, মা বলে।

– মা চললাম, জল আনতি যাই, পুকুরে। ঝকঝকে সোনার মত পেতলের কলসীটা কাঁখে নিয়ে হেলতে দুলতে সুখীদি এগোয়। – দেরী করিস না সুখী। তুই এলে ডাল বসবে । বাটনা বাটিসনি এখনও। মা বলে।

– না, দেরী হবেক না । বলে হেসে সুখীদি মুখ ফিরিয়ে মার দিকে চায় । তারপর রওনা দেয় ।

– ইস্ দাঁতগুলো কি ঝকঝকে সুখীদির । কি দিয়ে মাজে ? পলুর দাঁত তো অমনি নয় । আর সুখীদি হাঁটে কি সুন্দর! দুলে দুলে । ঠিক পরানদের হাঁসগুলোর মত । সবাই বলে সুখী সুন্দরী । কেউ বলে বুনো সুন্দরী । কেউ বলে সুখীরা নীচু জাত, ওরা বুনো । কে জানে বুনো মানে কি । পলু ভাবে । পলুদের বাড়ীতে কাজ করার আগে সুখীদি স্যান্যাল বাড়ীতে কাজ করত । ওদের জাঁদরেল এ্যালসেশিয়ান দোলনাকে সামলাতো । তাকে নিয়ে মাঠে দৌড়ত । সে এক দেখার মত জিনিষ । বিকেল হলে প্রায়ই পলু গিয়ে বসত পরাণদের বাড়ীর বারান্দায় । সুখীদি আর এ্যালশেসিয়ানের দৌড় দেখবে বলে । তা পলু একা নয়, অমল, সুনীল আসতো – পরিমলদা, বাচ্চুদা তারাও সুখীদির দৌড় দেখতে আসতো । তো একদিন হলো কি, কি কারনে যেন এ্যালসিশিয়ানটা হঠাৎ বেমক্কা প্রানপণ ছুটতে শুরু করল । সুখীদি তো কুমড়োপটাশের মত গড়িয়ে যেতে লাগলো .... মজা পেয়ে পলুরা হৈহৈ করে হেসে উঠেছিল । কিন্তু সেটা একদমই মজার ব্যাপার ছিল না । উল্টেপাল্টে পড়ে সে এক বিভৎস ব্যাপার হয়েছিল । হাত ভাঙল সুখীদির, পাও । ছ'মাস বিছানায় শুয়ে রইল । পলুর বাবা ডাক্তার । বাবা সুখীদিকে ভাল করে দিল । ভালো হয়ে সুখীদি আর দোলনাকে দেখাশুনো করতে স্যান্যাল বাড়ী ফিরে যায় নি । পলুদের কাজ করা শুরু করে । তবে স্যান্যাল বাড়ীর মিস্টিপুকুরের জল আনার জন্য সে বাড়ীতে সুখীদি যায় এবং অনেকক্ষণ সময়ই সেখানে কাটায় । আজও শেষ পর্যন্ত পলুকেই যেতে হল সুখীদির খোঁজে ।

পলু প্রথমে মিস্টিপুকুরে গেল । সেখানে সুখীদি নেই । স্যান্যালদের রান্নাবাড়ীর দালানে গেল – সেখানে নেই সুখীদি । রান্নাবাড়ী থেকে ফিরতেই দেখে বড়বাড়ীর দালানে সুখীদি হাঁটু মুড়ে বসে দু হাত দিয়ে স্যান্যালবাবুর পিঠ মালিশ করে যাচ্ছে । স্যান্যালবাবু আরাম করে রোদে পিঠ দিয়ে বসে মালিশ খাচ্ছেন । সকালের রোদ সাদা ধপ ধপে পিঠে পড়ে চমকাচ্ছে । কোমরে ধুতির ফাঁসটা আলগা হয়ে পেছনের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে । পলু সে দিকে তাকিয়ে কি জানি কেন পেছন ফিরে দুড়দাড় করে বাড়ীর দিকে ছুট । মনে আছে সেদিন সুখীদি বাড়ী ফিরলে মা খুব বকেছিল আর সুখীদি হাপুস নয়নে কেঁদে যাচ্ছিল । এরপরে সুখীদি পলুদের বাড়ীর কাজ ছেড়ে স্যান্যাল বাড়ীতেই ফিরে গেছিল আবার ।

স্যান্যাল বাড়ীর তখন রমরমে অবস্থা । মফঃস্বল শহর কুসুমপুরে সার্জন বলতে সবাই একডাকে স্যান্যাল কাকুকেই জানতো । বিরাট প্রাসাদের মত দোতলা বাড়ী । কাস্ট আয়রনের জাফরী ঘেরা দালানের মাথা । তেমনি সুদৃশ্য কারুকাজ করা রেলিং । বাইরে মাঠের একপাশে টেনিস কোর্ট । পেছনে ফলের গাছ ঘেরা মিস্টি জলের পুকুর । পুকুরে বড় বড় মাছ ঘাই মারত । সবাই বলতো রাতে নাকি মৎস কুমারীরাও চাঁদের আলোয় চান করতে আসে সেই পুকুরে । পলুর খুব ইচ্ছে করত সেই সব মৎস কুমারী না কি তাদের একবার দেখবে । কিন্তু সেটা আর কখনও হোয়ে ওঠেনি । যাই হোক সে ছিল এক স্বপ্নের বাড়ী । পলুদের বাড়ী ছেড়ে সুখীদি সেখানে যাবে না তো কোথায় যাবে । রথী আর পলু ছিল সমান বয়সী । আর গলাগলি বন্ধু । কি করে যে রোগা ভিতু পলুর সাথে সুন্দর আর সাহসী স্যান্যালবাড়ীর ছেলে রথীর বন্ধুত্ব হোল কে জানে । রথীর দিদিদেরও দেখেছে পলু । তারা কেউই কুসুমপুরে থাকে না । ওরা সব পরীর মত সুন্দর দেখতে । তার মধ্যে একজন ছিল গোলাপের পাঁপড়ির মত গায়ের রঙ । সেই দিদিকেও খুব অদ্ভুতভাবে দেখেছিল পলু । রথী বলেছিল – জানিস কাল রাতে বড়দি এসেছে কলকাতা থেকে । আসবি বড়দিকে দেখতে ?

পলু বলেছিল – না, আমার লজ্জা করে ।

রথীর তখন খুবই বন্ধুত্ব পলুর সাথে । তাই বললো – দাঁড়া একটা বুদ্ধি বার করি । ঠিক হলো স্যান্যালবাড়ীর ভেতরের উঠোনের এক কোণে যে শিউলি গাছটা আছে তার তলায় বসে পলু মুখ নীচু করে ফুল কুড়োবে আর রথী গাছ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করো বলবে – দিদি দিদি ফুল নেবে ? তখন দিদি বাইরে আসবেই আর পলু তখন মুখ তুলে, ঝট করে একবার দিদিকে দেখে নেবে .... রথীর কলকাতার দিদিকে । তো সে ভাবেই পলু সেই মিশরের রানীর মত দেখতে দিদিকে দেখেছিল । রথীর মাও কম সুন্দরী ছিলেন না । কিন্ত তার ছিল প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব । স্যান্যাল সাহেবের যে সুখীদিকে পছন্দ সেটা কুসুমপুরের বেড়ালগুলোও জানতো । পলুতো তো কোন ছাড় ।

তো রথী পলুর বন্ধুত্বে একদিন গন্ডোগোল শুরু হয়ে গেল। রথীর বড়দির মেয়ের মুখে ভাত। সব বাড়ীর বাচ্ছারা নিমন্ত্রিত। পলু আর তার দাদাও আছে নিমন্ত্রিতের দলে। রথীদের রান্নাবাড়ীর দালানে শীতল পাটির ছোট ছোট ফুল কাটা আসন এক সারিতে পেতে দেওয়া হয়েছে। পলুদের সেদিন পৌঁছুতে একটু দেরী হয়েছিল। গিয়ে দেখে সবাই বসে গেছে। ওদের দেখে বামুনদিদি বসে থাকা সবার সারি থেকে একটা আসন একটু দূরে পেতে দিয়েছিল।পলু দাদার দিকে তাকিয়েছিল। চোখে বিস্ময় ও প্রশ্ন – আমরা তফাতে কেন ? দাদা কি বুঝেছিল কে জানে। নিমিষে দালান থেকে নেমেই ছুট।

পলুও ছুটতে শুরু করতেই বামুনদিদি খপ করে ওর হাতটা চেপে ধরে ফেলেছিল। বলেছিল – একদম যাবি না তো পাতা আসন ফেলে। জানিস না তাতে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। ওই মুখ্যুটা তো চলে গেলো। কি হয়েছেটা কি ? তোরা তো বামুন নোস তাই ছোঁয়া বাঁচিয়ে বসালাম। পলুর মুখ রাঙা হয়ে গেছিল।

তারপর থেকে পলু রথীদের বাড়ীতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। রথীকে এড়িয়ে চলতো। রথী অনেক সাধ্য সাধনা করে পলুর কাছ থেকে সেদিনের কথাগুলো বের করে ফেলেছিল আর তারপর হা হা করে হেসে উঠেছিল। – ও এই কথা ? তোরা তো সব ব্যাপারেই আমাদের থেকে ছোট। এটা আর নতুন কি ? চল চল খেলবি চল। বলে আবার হেসেছিল। বামুনদিদির কথায় যতটা না, তার চাইতে বেশী কষ্ট দিয়েছিল রথীর কথাটা। দুরন্ত রাগে রথীকে এক ধাক্কায় সরিয়ে পলু চলে এসেছিল সেখান থেকে। তারপর থেকে ওরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দী। কে বড় তার প্রতিযোগিতা এবং অদ্ভুত, অসম আর নিষ্ঠুর সেই প্রতিযোগিতা। পরীক্ষক রথী। পরীক্ষার্থী পলু। কারণ সব দিক থেকে রথী তো বড় হয়েই আছে ও আবার কিসের পরীক্ষা দেবে ?

পলু তার ছোটমাসীর মেয়ের জন্মদিনে যাবে। রথী বলে – তুই তো খেতে যাচ্ছিস। দেখি তো না গিয়ে পারিস কি না। আমি জানি তুই ঠিক ল্যাড় ল্যাড় করতে যাবি। পলু গর্জন করে উঠেছিল। মোটেই খেতে যাচ্ছি না। তারপর সত্যি সত্যি মা, দিদিরা যখন সাজ পোশাক করছিল পলু গিয়ে বসেছিল সামনের স্কুল বাড়ীর সিঁড়িতে। মন খারাপ আর একটা তীব্র জেদ রথীর কাছে না হেরে যাবার ওকে অবশ করে রেখেছিল। মায়ের অনেক সাধ্য সাধনা সত্বেও পলু জন্মদিনে যায় নি। সত্যি পলুটা যে কি বোকাই ছিল। বিশেষ করে একদিনের কথা মনে পড়ে যখন রথীর অত্যাচার পলুকে বাগে আনতে না পেরে একেবারে চরমে পৌঁছেছিল। সেদিন রথী পলুকে ওর উরুর ওপর থেকে এক ঝটকায় হাফ প্যান্টটা সরিয়ে ওর নরম চামড়ার ওপর একটা কাঁটা কাঁটা বুকলীফ পাইন পাতা সজোরে চেপে ধরেছিল। বলেছিল – বল লাগছে ভীষণ ।

পলু যন্ত্রনায় কেঁপে গেছিল। উরু লাল হয়ে ফুলে গেছিল দাগড়া দাগড়া হয়ে। তবু পলু হার স্বীকার করে নি। ব্যাপারটা অনেকক্ষণ ধরে চলছিল। আরো হয়তো চলতো যদি না স্যান্যালবাড়ীর টেনিস কোর্টের আলো জ্বলে উঠতো .... আর টেনিসের সাদা পোশাক পড়া রথীর ছোড়দা ওদের দেখতে না পেতো .... পলুর অবিচল মুখ দেখে খেপে গিয়ে রথী বলেছিল – কোনদিন আমাদের মাঠে পা দিবি না পলু।

পলু বলেছিল – দিলে কি করবি ?

– তোর মাথা ফাটিয়ে দেব।

তাও পলু মাঠে গেছিল তারপর এবং রথী তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এক সাথে ঢিল ছুঁড়ে পলুর মাথা সত্যি সত্যি ফাটিয়ে দিয়েছিল।

বন্ধুত্বের যবনিকা পড়েছিল। স্কুল ছেড়ে পলু ডাক্তারী পড়তে কলকাতায় চলে এল। স্যান্যালবাড়ীতে শোনা গেল স্যান্যাল কাকীমাও হঠাৎ ছেলেমেয়ে নিয়ে কলকাতা চলে গেছেন। পলুর বাবা মাও কুসুমপুরের বাড়ী বিক্রি করে চলে এলেন কলকাতায়। কুসুমপুরের পাট চুকলো। কিন্ত স্যান্যাল কাকু রয়ে গেলেন কুসুমপুরে।

তারপর দীর্ঘ এক যুগ পরে পলু গেছিল কুসুমপুরে। স্কুলের রিইউনিয়নে। বন্ধু শ্যামলের বাড়ীতে উঠেছিল। শ্যামল বলেছিল ওদের নীচতলাতে থাকে এক বয়স্ক ভদ্রলোক। তার ফ্যামিলিও থাকে কলকাতায়।

শ্যামলের সাথে ওদের বাড়ীর ওপরতলায় উঠতে উঠতে নীচতলার ভাড়াটেদের ঘরে হঠাৎ চোখ পড়ে গেছিল পলুর। এক বয়স্ক ভদ্রলোক ইজিচেয়ারে বসে। তার মাথার পেছনটা দেখা যাচ্ছে। এক মহিলা বিছানা ঝাড়ছে পেছন ফিরে। পেছনটা দেখে পলু চমকে গেছিল। চেনা চেনা এত ! মহিলা মুখ ফেরাতেই সন্দেহের আর অবকাশ রইল না ..... সুখীদি। আর ইজি চেয়ারে স্যান্যাল সাহেব। পলু পাথর হয়ে গেছিল। সুখীদি বিছানা ঝাড়া ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে এসেছিল। চেয়েছিল ওপরতলার দিকে পলুদের ওঠার পথে।

– তুমি আজও খালি পেপারই পড়ে যাবে বাবা ? কিশোরী কন্যার ডাকে সম্বিত ফিরে আসে পলাশবরণের। কন্যা রুচি। লাবন্যময়ী স্বাস্থ্যজ্জ্বল কিশোরী কন্যার দিকে তাকিয়ে রথীর বিজ্ঞপনের কিশোরী কন্যার কথা মনে ভেসে ওঠে। বিচলিত পলাশবরণ অস্ফুটে বলেন – তুমি যাও। আমি আসছি।

পলাশবরণ তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে দুরে বহু দূরে, যেখান চিলেরা ভেসে বেড়ায় তারও অনেক ওপরে। যেখান থেকে উজ্জ্বল আলোকধারা ঝরে ঝরে পড়ছে অবিরল পৃথিবীর ওপরে .... অনাবিল সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে হালকা পায়ে .... কে বলবে এত কুয়াশা ছিল, এত ধূসর মেঘ ছিল এখানে এই গতকালও। পলাশবরণ বললেন – তাই হোক ঠাকুর ..... তাই হোক .... আলোকের এই ঝর্ণাধারায় সব ধুইয়ে দাও। আমার এতদিনের ধূলার ঢাকা সরিয়ে দাও .....

বহুদিনের জমে থাকা অবরুদ্ধ গ্লানির অর্গলটি যেন খুলে যেতে থাকে। পলাশবরণ আবার কাগজটি খোলেন ..... কোথায় যেন ..... বিজ্ঞাপনের পাতাটি .....

Saswati Basu — Profession: University Teacher in Economics, lives in Sydney.

I enjoy this beautiful life thoroughly. Particularly I enjoy listening to songs, reading books on sociology, short stories, and travelling around. I love watching drama, good cinema and tennis. I also love to experiment with new cooking recipes and share them with our friends. Believe in donating money to voluntary organisations for the people in need.

পারিজাত ব্যানার্জী

ছোটগল্প – সূর্যাস্ত পর্যন্ত

আদিগন্তে যাই দেখা যায়, তার সবই ভীষণ বড্ড রকমের অধরা। মেঘের টুকরো কোড়ানোর ফাঁকে ফাঁকেই আস্ত আকাশটা তাই সবসময় ম্রিয়মাণ হয়ে নিস্তেজ থাকে পরে, মনমরা। যেটুকু দেখা যায় সবুজ বনাঞ্চল ইঁট কাঠ কণ্‌ক্রিটের এই অট্টালিকাদের জঙ্গলে, সেখানে নিঃশ্বাসে বাসা বাঁধে দূষণ, দেওয়ালের খসে যায় পলেস্তারা।

হাঁপ ধরে ওঠে রবির। তবে এই দেখার জন্যই বুঝি আবার নেওয়া এই জন্ম ? কত সহস্রকোটি মহাসমুদ্র পেরিয়ে পৃথিবীর হ্রদ বেয়ে আবার পৌঁছনো গেছে এ ভবপারে, তা কি শুধু তবে নেহাৎই প্রহসন ? শেষ নিঃশ্বাসটুকু যখন অন্তস্তল থেকে নিংড়ে দুমড়েমুচড়ে বেরিয়ে এসেছিল অশীতিপর ওই শরীরের বুক চিড়ে, মনে হয়েছিল তখন, "না না না ! আরও কত কাজ রয়ে গেছে বাকি, কত লেখারা জমা রয়ে গেছে আলখাল্লায় ঢাকা জীর্ণ এই মননে – এ সব ছেড়ে চলে যাওয়ার যে সাধ হয় না আমার ! মানছি, এ জীবনের আয়ু ছিল আমার অনেক নিকট মানুষের চেয়ে বহুগুণে অধিক – তবু আগামীর সুন্দর স্বাধীন ভারতে কি সুযোগ হবে না আরও একটিবার নবরূপে ফিরে আসার ? এটুকুই তো চাওয়া আমার ! এটুকুই তো শেষ বাসনা ! তবে কেন অনিশ্চয়ের পথে তীব্র গতিতে এমন বিপুল বেগে ধাবিত হচ্ছে আমার অনির্বচনীয় চেতনা ? নাঃ, সত্যিই, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে !' "

২০১৯ এর নববর্ষের সকালে "এসো হে বৈশাখ, এসো এসো" গানটা টিভির পর্দায় এক লাল পেড়ে শাড়ি পরা নবীন তনয়াকে গাইতে দেখে হরলিক্স আর পুরু মাখন লাগানো পাঁউরুটির থালাটা একটু সরিয়ে কেমন যেন থমকে গিয়ে সেদিকেই সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে রইল বছর সতেরোর রবি। ছিপছিপে রোগা গড়ন তার, ফর্সা ধবধবে গায়ের রঙের সাথে মিলেমিশে গেছে যেন অগোছালো সামান্য দাড়ি আর ঈষৎ মৃদু স্পর্ধা। তার মায়ামাখানো নয়নজোড়ার সামনে দিয়ে ছবির মতো ভেসে চলেছে পরপর বহু দৃশ্য – যার কোনটাই এজন্মের কথা নয়, তবু ভীষণভাবে চেনা, ঠিক যেন তারা নিজের সাথে বলে চলা সময়োভাবে অকথিত থেকে যাওয়া সব অবান্তর বহুযুগের কথোপকথন! বা হয়তো তারা শুধুই নতুন কল্পনাদের আনকোরা কোনো বীজ, যার ঠিকমত স্বপ্নে কখনো হতে নেই ফলন !

প্রথম প্রথম বড় অস্বস্তি হত। মনের মধ্যে বারবার প্রশ্ন জাগত, এসবের মানে কি? কি ভাবেই বা হবে এসবের প্রতিকার ? আজ আরও একটা নববর্ষ যখন এসে দাঁড়ালো দোড়গোড়ায়, প্রভাতফেরীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রবীন্দ্রসঙ্গীতের তান, তখন আর তেমন অবাক একেবারেই হল না অবশ্য সে আর। জানে রবি, সকলকে বোঝানো যাবে না তার মনের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকা এই বৈদ্যুতিন তরঙ্গ – সবকিছুর কখনও এভাবেই নাও পাওয়া যেতে পারে উৎস !

নাহ, রবি আর কবিতা লেখে না। শব্দরা আসতে থাকে কোনো অযাচিত আস্কারায়, তবে তাদের আর ছন্দের মোড়কে বাঁধে না সে নিজের নেশা চরিতার্থ করার আশায়। অন্ততপক্ষে ওরা তো স্বাধীন থাকুক! বাড়িয়ে তুলুক ওদের নিজেদের জীবনকাল! খাতা বা ট্যাবের কোটরে বন্দী হয়ে অথবা সোশ্যাল মিডিয়ার স্টেটাস আপডেট হয়ে বেঁচে থাকাটার মধ্যে কোথায় আছে সুখ অহমিকার? কথামালাদের এভাবে জোর করে গল্প বা কবিতায় আটক করাও তো অসমীচীন – ইশ, আগে কেন মনে আসেনি এসব ভাবনা তার? এর চেয়ে আকাশেই বরং ঘর গড়ে নিক ওরা – পাখিদের বাসায় ডিম ফুটে বের হয়ে আসুক নবজন্মকাল!

'শেষ হয়েও হইল না শেষ !' সত্যিই, এভাবে সবকিছু শেষ করার বাসনা তো তারও ছিলনা কখনও। কিছুটা বাঁচিয়ে রেখে উল্টেপাল্টে পড়ে দেখার স্বাদই তখন মনে হয়েছিল না জানি কত আলাদা ! অথচ আজ যখন সময় থমকে গেছে

পুরোনো কোনো উত্তর কলকাতার বাড়ির চিলেকোঠায়, তখন সবকিছু থেকেও নিঃস্ব হয়ে পড়ছে দৈনন্দিন জীবন ও সমাজ অপারগ অবহেলায়। নিউটাউনের বিশাল কমপ্লেক্সের একুশ তলার ঝাঁ চকচকে পেন্টহাউসে বসে ছুঁয়ে দেখা যায়না সেসব পরপার!

"কি ব্যাপার রবি, তোমার এখনও ব্রেকফাস্ট শেষ হল না? ইটস্ অলরেডি নাইন !" লাবণ্য আরও একবার ব্রাশ দিয়ে নিজের চুলটা সেট করে নেন খানিক। তারপর টিভির রিমোট'টা কাবার্ডের উপর থেকে তুলে তার পাওয়ার বাটনটায় আলতো চাপ দেন। থমকে যায় গান নাচ আর সাংস্কৃতিক প্রভাতফেরীর স্বপ্ন, নববর্ষও হয়ে যায় আবার নিয়মমাফিক ম্রিয়মাণ!

"এখন টিভি দেখলে তুমি তৈরী হবে কখন ? সত্যি বলছি, তোমার বাবা, আমি তোমায় নিয়ে সত্যিই ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে পড়ছি কিন্তু এবার ! তোমার নেক্সট ইয়ার হায়ার সেকেণ্ডারী, মেডিকেল এন্ট্র্যান্স, আর তুমি সব ছেড়ে কিনা সাতসকালে এইসব নাচগান দেখতে বসলে ?"

রবির চোখমুখে অবশ্য লাবণ্যর এই উত্তাপ প্রতিফলিত হয় না। শান্ত গলায় খুব স্বাভাবিক সুরে শুধু সে শুধোয় একবার, "আজ এই নববর্ষের দিনেও বুঝি ছুটি নেই তোমার ? অবশ্য ছোটাছুটির এই ডামাডোলে থমকে দাঁড়ানোও তো এখনকার দিনে মারাত্মক বড় অপরাধ ! তাই না !"

লাবণ্য তাকান তাঁর ছেলের শান্ত মুখমণ্ডলের দিকে। কি সুন্দর মায়ামাখানো নিষ্পাপ সে মুখ! দেখলেই সব ভুলে ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে তাঁর। তারপরেই ভয় হয়, রবি কেমন পাল্টে যাচ্ছে যেন, যদি আর তিনি কাছে গিয়ে চিনতে না পারেন তাকে, তবে ?

ছোটবেলা থেকেই তাঁদের ছেলে বাদবাকি সকলের থেকে আলাদা। তার নিজস্ব নিভৃত জগতেই তার বাস। সবার সাথেই মিশেছে সে – আবার সবার থেকেই দূরেও থেকে গেছে যেন বরাবর। তাতে একদিক দিয়ে সুবিধাই হয়েছিল লাবণ্য আর অমিতের। নিজেদের কেরিয়ারের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উপরে ওঠার সময় ছেলেকে নিয়ে বিশেষ একটা ভাবতে হয়নি কখনও তাঁদের। মনকে বুঝিয়েছেন বরাবর, "এসবই তো করা শুধুমাত্র রবির জন্যই" – তবে মাঝরাতে বাড়ি ফিরে ক্লান্ত শরীরটাকে কাউচে এলিয়ে দেওয়ার সময় ছেলে যখন দাঁড়িয়েছে এসে পাশে, তখন আর তাঁরা না জানি কোন দ্বিধায় চোখ মেলাতে পারেননি ওই ছোট্ট মানুষটার পলকের পাতায়।

বড় সাধ করে ছেলের নাম দিয়েছিলেন রবি। 'শেষের কবিতা'য় যেমন রবিঠাকুর সৃষ্টি করেছিলেন 'লাবণ্য' আর 'অমিত' কে, ঠিক তেমনই তাঁদের মিলনের সাক্ষী থাকুক এই নতুন 'রবি' – এমনই ছিল তাঁদের বাসনা। তবে রবির বেড়ে ওঠার সময় তার পাশে যতটুকু দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল, বোঝেন লাবণ্য, তা তাঁরা কোনোভাবেই দিয়ে উঠতে পারেননি। তাই দূরে সরে যেতে যেতেও টের পেয়েছেন তিনি হয়তো বা মা বলেই, ছেলেটার একাকিত্বই সবচেয়ে বড় সঙ্গী। বোলপুরে তাঁদের কাটানো ছোটবেলার মতো সেখানে আর তাই কোপাই নদীর বা শান্তিনিকেতনের বিকেলের হাওয়া বইতে পারে না।

অফিসের ব্যাগটা নামিয়ে রবির দিকে এগিয়ে যান লাবণ্য। দূর থেকে কাছে আসতে আসতে লক্ষ্য করেন তিনি, চারাগাছ থেকে ধীরে ধীরে কেমন মহীরুহ হয়ে উঠছে তাঁদের সন্তান। ছেলের মাথার একঢাল এলোমেলো চুলগুলো ভালো করে নেড়েচেড়ে দিতে দিতে এক অপ্রস্তুত হাসি মাখিয়ে বলে ওঠেন লাবণ্য, "ও হ্যাঁ, আজ তো নববর্ষ, দেখেছো, আমার তো মনেই ছিল না। অফিসে যদিও ছুটি নেই, তবে আমার বেশ কিছু ছুটি পাওনা আছে। আজ একটা সি এল নিয়ে নিই, কেমন ? তারপর দুজনে মিলে একটু জোড়াসাঁকো ঘুরে আসব ! তোমার তো ভারী পছন্দের জায়গা জোড়াসাঁকো, তাই না ?"

মায়ের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে ম্লান হাসে রবি, "এভাবে আর জোড়াতালি দিয়ে সবদিক তো রক্ষা করা যায় না ! হয়তো এটুকু শিক্ষাই অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল, বুঝিনি আগে, কল্পনা কখনও বাস্তবের কঠোরতার সফরসঙ্গী হতে পারেনা !

না মা, তুমি অফিস যাও, আমারও জয়েন্ট এন্ট্যান্সের কোচিং ক্লাসে যাওয়ার আছে। সত্যিই তো, এই গান, নাচ, সংস্কৃতি, আবেগ – এসবের এখন আর সময় না!"

লাবণ্য তাঁর নীচের গোলাপী ঠোঁটটা কামড়ে ধরেন ব্যাকুলতায়। শেষ চেষ্টা করেন তিনি সবকিছুকে আঁকড়ে ধরার। "আজ একদিন ওসব বরং থাক না বাবা !"

মাথা নাড়ে রবি। "আমার এখনই তো তোমাদের ছাঁচে নিজেকে গড়ে নিয়ে সবার মতো সামনে এগিয়ে যাওয়ার বেলা মা, আমায় তাই আর এভাবে কক্ষণও ওইরকম করে পিছু ডেকো না !"

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

সমুদ্রের যা-কিছু গান সে কেবল তার নিজের ঢেউয়ের – তার কোলে জীব আছে যথেষ্ট, পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাদের কারো কণ্ঠে সুর নেই; সেই অসংখ্য জীবের হয়ে সমুদ্র নিজেই কথা কচ্ছে। ডাঙার জীবেরা প্রধানত শব্দের দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে, জলচরদের ভাষা হচ্ছে গতি। সমুদ্র হচ্ছে নৃত্যলোক, আর পৃথিবী হচ্ছে শব্দলোক।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জাপান যাত্রী, ২৪শে বৈশাখ, ১৩২৩

দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

সুগন্ধা ও বাতাসবাবু

সুগন্ধার বাড়িটা খুব অদ্ভুত। মানে এমনি দেখলে বোঝা যায়না। সাধারণ যে কোনো বাড়িরই মতো। কিন্তু দরজা জানলাগুলো হুটহাট, দুমদাম খোলা বন্ধ হয় নিজের থেকেই। বাতাস ঢোকার সেরকম জায়গা না থাকলেও কোন দিক দিয়ে যে ঢুকে পড়ে কে জানে ? সুগন্ধা অবশ্য খুব সতর্ক থাকে। ব্যালকনির দরজা আটকে, জানলা, দরজার ভারী ভারী পর্দা গুলো টেনে দেয়। উইন্ডচাইম খুলে রাখে। কারণ ওই টুং টাং আওয়াজ শুনলেও সুগন্ধার মনে হয় কে যেন এসেছে ! অথচ কে যেন ঢুকে পড়ে ঘরে, তাকে চোখে দেখা যায়না। বাথরুমের দরজাটা আপনা আপনি খুট করে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর সুগন্ধা টানাটানি করে। কে যেন সেটাকে ভেতর থেকে টেনে রাখে। এইভাবে একটা মজার খেলা চলে। এই তো সেদিন সুগন্ধা সবে হেনা শ্যাম্পু করে বারান্দায় রোদে বসে চুল শুকোচ্ছিলো। বাতাসটা তো বাইরের দিক থেকে আসার কথা, কিন্তু বাইরে ছিল কটকটে রোদ, খটখটে শুকনো। কিন্তু বাতাসটা এলো ঘরের দিক থেকেই। চুলগুলো উড়িয়ে দিয়ে ঘাড় গলা, ছুঁয়ে দিয়ে গেলো। একটা শিহরণ ছড়িয়ে পড়লো সুগন্ধার সারা শরীরে। তারপর একদিন আশ্চর্য হয়েই সুগন্ধা দেখলো টেবিলে-এর এক কোণে পেন্সিলে লেখা ছিল তার নাম। আর একদিন বাথরুমের আয়নাতে।

তারপর এই তো সেদিন ছাতের ওপর একটা অচেনা নীল রুমাল এসে পড়লো। সুগন্ধা অবাক হয়ে দেখলো। সেই রুমালে একটা চন্দনের মতো হিম হিম গন্ধ। দীপাবলির রাতের শিশিরের গন্ধ। এর পরে মাঝে মাঝেই সেই গন্ধটা আচমকা ঢুকে পড়তো ঘরে। সুগন্ধার টেবিলের খাতা পত্র, বইয়ের পাতাকে এলোমেলো করে দিত আচমকা। সুগন্ধা হাসতো মনে মনে, কী ছটফটীয়া স্বভাব এই বাতাসবাবুর !

একটা জিনিসও গুছিয়ে রাখার জো নেই। হ্যাঁ সুগন্ধা তার নাম দিয়েছিলো বাতাসবাবু। সুগন্ধা আবার উইন্ডচাইমটা লাগিয়েছিল। "যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে ভালোবাসে আড়াল থেকে" সুগন্ধা এই গানটা যখন গাইতো। তখন টুং টুং করে উইন্ডচাইমে সুর তুলতো বাতাস বাবু। আর সুগন্ধা যখন গাইতো "আমার সকল দুখের প্রদীপ" তখন প্রদীপের শিখার মতো স্থির হয়ে থাকতো বাতাস বাবু। আর সুগন্ধার গল্পের বইয়ের পাতা উল্টে একটা নির্দিষ্ট পাতা যখন স্থির হয়ে থাকতো , তখন সুগন্ধা ভাবতো আজ এই গল্পটাই শুনতে চাইছে বাতাস বাবু। বাতাস বাবু অনেক উপহারও দিতো সুগন্ধা কে। যেমন হঠাৎ উড়ে আসা একটা ঝরা পাতা, একটা কাগজের এরোপ্লেন, অথবা একটা লাল নীল পেটকাটা ঘুড়ি। কখনো একটা বেলুন, যার গায়ে ময়দানের গন্ধ লেগে আছে। ফিসফিস করে মাঝে মাঝে বাতাস বাবুর কথা শোনা যেত এফ এম এ। যেখানে কোনো চ্যানেল নেই সেখানে। শোনা গেলেও পুরোটা বোঝা যেত না। কিন্তু তাতেই সুগন্ধা খুশি। সব কিছু না বুঝলেও তো চলে, নিজের মতো ভেবে নেওয়া যায়। এবারে উল্টোদিকের কথা। বাতাসবাবুর নাম বাতাস বাবু নয় আসলে। কিন্তু এখানে তাকে ওই নামেই ডাকা হবে। বাতাসবাবুর নতুন বাড়িটা বড় অদ্ভুত। শুধু মনে হয় পায় রিনিরিনি নূপুরের শব্দ তুলে কেউ এক জন এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাকে চোখে দেখা যায় না। শুধু একটা গোলাপের মতো মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়।

বাতাস বাবুর এলোমেলো বইগুলো কে যেন দিনের শেষে গুছিয়ে রাখে। কে যেন ধুলো পড়া আয়না, আসবাবপত্র মুছে রাখে। বাথরুমে ঢুকলে হঠাৎ করেই হেনা শ্যাম্পুর গন্ধ পাওয়া যায়।

প্রথম প্রথম খুব অদ্ভুত লাগতো বাতাস বাবুর। রাতের বেলা একটু গা ছমছমও করতো। কিন্তু বাতাস বাবু মনে মনে তার নাম দিয়েছে সুগন্ধা। বাতাস বাবুর প্রিয় রুমালটা সেদিন হারিয়ে গেলো। ছাতে রোদে দেওয়া ছিল। নিশ্চই সুগন্ধাই লুকিয়ে রেখেছে। ওই অদ্ভুত বাড়িতে মাঝে মাঝে অন্য ঘরটা বন্ধ থাকলে, বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে মিহি গলার গান ভেসে আসে বাতাস বাবুর কানে, "আমার সকল নিয়ে বসে আছি, সর্বনাশের আশায়।"

ডঃ দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। জন্ম – মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জে। কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত সাহিত্য এবং বৈদিক সাহিত্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। ব্যাঙ্গালোরের জৈন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি করেছেন। সম্পাদনা করেন বাংলা কিশোর ওয়েব ম্যাগ ম্যাজিক ল্যাম্প। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির শুরু। লিখতে ভালোবাসেন কবিতা ও ছোটগল্প। ছোটদের জন্য প্রথম গল্প সংকলন ''সাত আকাশের ওপারে'' (নান্দীমুখ প্রকাশন ২০০৫) প্রকাশিত হয় কলেজ পড়ার সময়। কবিতার সংকলন – কবিতার পঞ্চপ্রদীপ (দ্বীপ প্রকাশন ২০১৫), মেঘ বৃষ্টি কথা (ধানসিঁড়ি প্রকাশন ২০১৮), থ্রি, একটি থ্রিলার সংকলন (ফ্যাভ বুকজ পাবলিকেশন ২০১৮)। এছাড়াও কিশোর ভারতী, শুকতারা, আনন্দমেলা, প্রভৃতি পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্ন ওয়েবম্যাগে গল্প, কবিতা লিখে থাকেন। এই প্রথম প্রাপ্তমনস্ক থ্রিলার লিখছেন। লেখালেখির বাইরে কবিতা পাঠ, গল্প পাঠ করতে, ছবি আঁকতে, ও বই পড়তে ভালোবাসেন।

"অন্য কথা পরে হবে।
গোড়াতেই বলে রাখি তুমি চা পাঠিয়েছ, পেয়েছি।
এতদিন খবর দিই নি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ব।
যেমন আমার ছবি আঁকা, চিঠি লেখাও তেমনি।
ঘটনার ডাকপিওনগিরি করে না সে।
নিজেরই সংবাদ সে নিজে।"

শেষ সপ্তক ২/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৌমিত্র চক্রবর্তী

শ্রদ্ধায়-অশ্রদ্ধায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি কতটা শ্রদ্ধা করে আর কতটা করেনা কিংবা ঘুরিয়ে বলতে গেলে কতটা অশ্রদ্ধা করে আর কতটা করেনা, তার হিসাব কষতে গেলে কালনেমির লঙ্কাভাগের শেষে যদি কাকেশ্বরকুচকুচের মতো হাতে কেবল একটা পেনসিল থাকে, তবে তা তেমন আশ্চর্যের কিছু হবেনা বলেই মনে হয়। বাঙালির কবিগুরু প্রেম চিরকালই আন্তরিকতা আর হুজুগের অ্যায়সা খিচুড়ি হয়ে রয়েছে যে চাল-ডাল আলাদা করে কার সাধ্যি। এবারই দেখলেন না, দোল উৎসবে শান্তিনিকেতনে কি হল। রবি ঠাকুরের পাড়ার উৎসব, অতএব ভূতের ভবিষ্যৎ সিনেমার মস্তান "পোমোদ পোধান"-এর মতো "দাদা আমাদের সান্সকিতিক" বলে বাঙালি এমন ঢল নামালো যে একেবারে হা রে রে রে রে রে আমায় ছেড়ে দে রে দে রে অবস্থা। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক আছেন, তিনি মাঝে মাঝেই শান্তিনিকেতন যান। কেন যান, তা তিনিই জানেন। কিন্তু যখনই যান, ফেসবুকে পোস্ট দেন "দাড়িবুড়োর দেশে যাচ্ছি'। আরেকজন আছেন যাঁর আবার রবীন্দ্রনাথের গল্প, কবিতা, গান, ছবি কোনোকিছুই চোখে পড়েনা। চোখে পড়ে বলতে কাদম্বরী, রাণু বা ওকাম্পোর সঙ্গে কবিগুরুর সম্পর্কের বাজারচলতি গল্পগুলো। এ তো কিছুই নয়। খোদ শান্তিনিকেতনের দোল উৎসবের একটা গল্প বলি। বিশ্বভারতীর এক অধ্যাপিকা আছেন। শান্তিনিকেতনে আমার অস্থায়ী বাসস্থানের মুখোমুখি বাসা তাঁর। একবার দোলের সকালে দেখলাম তাঁর বাড়িতে সাজো সাজো রব। ইয়া বড় বড় ডিজে বক্স বসছে। শুনলাম উৎসব হবে। বিশ্বভারতীর অধ্যাপিকার বাড়ির বসন্ত উৎসব, ভালো ভালো গান হবে নির্ঘাত, আমি তো যাকে বলে একেবারে "কান পেতে রই"। বেলা বাড়লে বাউল গান দিয়ে শুরু হল, প্রথমটাবেশ হচ্ছিল, হঠাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের কোমর বেঁকিয়ে ট্যুইস্ট নাচ শুরু হল। সেই দেখেই কিনা জানিনা, বাউল বাবাজি ধাঁ। তখন এ গান ও গান হতে হতে তারস্বরে শুরু হয়ে গেল ..... কি বলুন তো ? "জুম্মা চুম্মা দে দে"। দেখি দিদিমণিও উদ্দাম নাচছেন পাল্লা দিয়ে। আমি সোজা আকাশের দিকে তাকালাম যদি কবিগুরুকে হেঁচকি-টেঁচকি তুলতে দেখা যায়। কিন্তু ভদ্রলোকের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাতো চিরকালই অসাধারণ, নাহলে পঙ্কজ মল্লিক মশাইকে অনুমতি দেন "দিনের শেষে ঘুমের দেশে"-র লিরিক বদলানোর ! এই যে পাগলা হাওয়ার গানের সঙ্গে উলালা উলালা বলা হবে কিনা কিংবা জিন্স পরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া যাবে কিনা মার্কা বিতর্কগুলো তিনি তুড়ি মেরে ওড়াতেন বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ তিনি জানতেন তিনি কি, তিনি কতখানি আর কোথায়।

তবে ওই শান্তিনিকেতনেই দেখেছি, মানুষ কিভাবে শ্রদ্ধার ডালি সাজিয়েছেন তাঁর পদপ্রান্তে। ওখানে গেলে পায়ে পায়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে একবার ঘুরে আসি ঠিক। সেবারও গেছি, সুনীলবাবুর কাছের মানুষ ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গে দেখা। বাড়ির ভেতর ডাকলেন। ততদিনে সুনীলবাবু চলে গেছেন। কথায় কথায় উঠল বাড়িটিতে সুনীলবাবুকে নিয়ে একটা মিউজিয়াম গড়ে তোলবার কথা। ধনঞ্জয়বাবু জানালেন, তাঁরও ইচ্ছা প্রবল, কিন্তু স্পষ্টভাষায় না করেছেন সুনীল-জায়া স্বাতীদি। তিনি বলেছেন, যে স্থান রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-নির্ভর, সেখানে অন্য কারও স্মৃতিশালা গড়ে ওঠবার প্রশ্নই নেই। শ্রদ্ধায় মাথা ঝুঁকে এসেছিল সেদিন। আরেকটা ঘটনা বলি। ওখানে গেলেই ট্রেনে দেখা হয় এক বয়স্ক গায়কের সঙ্গে। শীর্ণ চেহারা, গলায় হারমোনিয়াম। মৃদু স্বরে কঠিন সব রবীন্দ্রসঙ্গীত গান তিনি অনায়াসে। বড় বিনম্র ভঙ্গী, যেন পূজা করছেন। শুনেছি সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় খুব ভালোবাসতেন ওনাকে। একবার দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ট্রেনে ফিরছেন, মানুষটি যথারীতি গান পরিবেশন করছেন। এক জায়গায় দ্বিজেনবাবুর মনে হল সুরে গন্ডগোল হচ্ছে। সেকথা বলতে ভদ্রলোক বিনীত ভাবে জানালেন যে তিনি এটাই ঠিক বলে জানেন। দ্বিজেনবাবু বাড়ি ফিরে স্বরলিপি মিলিয়ে দেখলেন, ভুলটা তাঁরই হচ্ছিল। পরেরবার দেখা হতেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন সে কথা। দ্বিজেনবাবুর এই উদারতা আর গায়কের ওই বিনীত আত্মবিশ্বাস — এ রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ছাড়া আসে কি ?

এবার শেষ করব নিজের জীবনের একটা কথা বলে। ছোটবেলায় স্কুলে শ্যামলী দিদিমণি বলেছিলেন, "বুঝলি, যখনই আমার খুব আনন্দ হয় বা খুব কষ্ট, আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে ছুটে যাই। তিনি আমার সবকিছু ভাগ করে নেন"। কিছুই বুঝিনি সেদিন। অবাকই হয়েছিলাম ভেবে এভাবে কি করে ভাগ করা যায়। বছর দুয়েক আগে হঠাৎ একদিন দিদিমণিকে ফোন করলাম। খুব খুশী হলেন। বারবার করে আবার ফোন করতে বললেন, কিন্তু ওনার বাড়ি যাওয়ার কথা বলতেই সজোরে না না করে উঠলেন। কারণ হিসাবে বললেন, "আমি এখন কারও সঙ্গে দেখা করছিনা রে। খালি খুব বই পড়ছি আর গান শুনছি"। কিছুদিন পরেই খবর পেলাম উনি মারা গেছেন। ক্যান্সারে ভুগছিলেন, আমাদের জানতে দেননি। সে মূহূর্তে বুঝেছিলাম কেন শ্যামলী দিদিমণি কাউকে বাড়ি যেতে দেননি। উনি আসলে তখন তাঁর চির আরাধ্য, প্রাণসখা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেষবারের মতো সবকিছু ভাগ করে নিচ্ছিলেন !

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

আরবার ফিরে এলো উৎসবের দিন।
বসন্তের অজস্র সম্মান
ভরি দিল তরুশাখা কবির প্রাঙ্গণে
নব জন্মদিনের ডালিতে।
রুদ্ধ কক্ষে দূরে আছি আমি –
এ বৎসরে বৃথা হল পলাশবনের নিমন্ত্রণ।
মনে করি, গান গাই বসন্তবাহারে।

(১৯৪১ এর একুশে ফেব্রুয়ারী দোল পূর্ণিমার দিনে অপরাহ্নে রচিত)

সুনয়না দত্ত ইয়াং

আমার কাছের রবীন্দ্রনাথ

আমি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত কলকাতার ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে পড়েছি। স্কুলের পরিধি ছিল পাঁচিলে ঘেরা। আর মস্ত চওড়া বারান্দা ছিল বাইরের দিকে। এল এর মতো দেখতে তিনতলা বাড়ী। ক্লাস রুমের ভিতরের জানালা দিয়ে দেখা যায় স্কুলের মাঠ। আর দরজা খোলে বারান্দার দিকে। খোলামেলা পরিবেশ। আমাদের মাঠ পেরিয়ে যে একটা বিরাট হলঘর ছিল তার নাম Mary Carpenter Hall । Hall এর তিনদিক থেকে একাধিক প্রবেশপথ আর একদিকে উঁচু বাঁধানো মঞ্চ। সেই মঞ্চে নানা উৎসবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হতো। এই হলঘরে প্রাত্যহিক প্রার্থনা দিয়ে শুরু হতো আমাদের স্কুলের দিন। ষষ্ঠ থেকে একাদশ শ্রেণীর প্রত্যেকটির একটা করে বিভাগ একটা করে লাইন এ দাঁড়াতো। আমাদের প্রার্থনায় রোজ কয়েক লাইন বেদমন্ত্র আর তারপরে কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত থাকতো। একাদশ শ্রেণীর মেয়েদের কেউ একজন কি গান হবে তা ঠিক করে নিয়ে গাইতে শুরু করতো। কোনদিন গাওয়া হতো "আকাশ ভরা সূর্য তারা", কোনোদিন বা "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার পরে" আবার কখনো "আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে" বা "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর"। আর এমনি করেই গানগুলো বেশ শেখা হয়ে যেত। আমাদের স্কুলে গানের ক্লাস হতো। সেখানেও শেখানো হতো এসব গান। মাসে একটি বৃহস্পতিবার একঘন্টার জন্য ব্রাহ্ম সমাজ থেকে আচার্য আসতেন উপাসনা করার জন্য। গান হতো তখনও। ভালো লাগতো সেই সময়টা। একদিন আচার্য বলেছিলেন, "যদি জানো যে বড়রা কেউ দেখছে তাহলে কোনো খারাপ কাজ করার থেকে নিরস্ত থাকো, তাই তো ? যখন অন্য কেউ সামনে নেই ঈশ্বর কিন্তু তখনও দেখছেন একথা যেন মনে থাকে কোনো গর্হিত কাজ করার আগে।" কথাটা খুব মনে দাগ কেটেছিল সেই ছোটবেলায়। এমনি করেই কিছু গান, কিছু কথা মরমের গভীরে পৌঁছে গিয়ে সোনার সুতো রূপার সুতো দিয়ে ঘর বেঁধেছে।

পঁচিশে বৈশাখ আমাদের বাড়ীতে সর্বদাই উদযাপিত হতো ফুল, মালা, খাওয়াদাওয়া আর গান বাজনায়। মা বাবার বিবাহবার্ষিকী ছিল সে দিন। বাইরের ঘরে রবীন্দ্রনাথের খয়েরী রঙের আলখাল্লা পরা পেছনে হাত দিয়ে দাঁড়ানো একটা ছবি ছিল দেওয়ালে টাঙানো। সেটাতে মালা পরানো হতো। মাসী আসতেন পদ্মফুল নিয়ে। রজনীগন্ধা তো আসতই। দুটো লম্বা ফুলদানি-সাদা, রবীন্দ্রনাথের মুখ আঁকা, রজনীগন্ধার গুচ্ছ সেখানে বসত। কোনো কোনো বার হয়তো জোড়াসাঁকোয় যাওয়া হতো সকালের গানবাজনা শোনার জন্য। এই পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ কাছে এসেছি রবীন্দ্রনাথের গান আর কবিতার।

আমার যখন ষোলো বছর বয়স তখন আমি আর আমার বোন গরমের ছুটির মধ্যে এক রবিবারের সকালে গেলাম নতুন গানের ক্লাসে। গানের মাষ্টারমশায় হলেন অর্ঘ্য দা-সেই সময়ের জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অর্ঘ্য সেন। বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে বাস থেকে নেমে একটু ভিতরে একটা বাড়ীতে ক্লাস বসে। গিয়ে দেখি জানা দশবারো ছেলেমেয়ে গোল হয়ে একটা জাজিমের ওপরে বসে আছে। অর্ঘ্যদা একটা কোণায় বসেছেন হারমোনিয়াম নিয়ে। যে গানটার দ্বিতীয়ার্ধ সেদিন চলছিল সেটা হচ্ছে, "ছায়া ঘনাইছে বনে বনে / গগনে গগনে ডাকে দেয়া।" এ গান আমি আগে কখনও শুনি নি। আষাঢ় তার ছায়াঘন বাতাস নিয়ে আগতপ্রায় তখন। দেয়া কথাটার অর্থ এবং তার প্রয়োগ সেই প্রথম শুনলাম। পিলু রাগের ওপর মিষ্টি সুরের সেই দুপুরের গানটি মনের মধ্যে রয়ে গেছে চিরদিনের মতো। গান শিখতে আসা ছাত্রছাত্রীদের সকলের গলাই বেশ শোনার মতো। বাড়ী ফিরে আসার পরও সেই সুর আমার সাথে গুঞ্জনে ঘুরেছিল সেদিন। তখন থেকে টানা পাঁচ বছর রবিবারের সকালটা বাঁধা ছিল অর্ঘ্যদার কাছে। একটা গান শেখানো শেষ হওয়ার মুখে জিজ্ঞাসা করতেন, "এর পর কি

শেখার ইচ্ছে ?" সেইমতো স্বরবিতান নিয়ে আসতেন ওনার কাঁধের শান্তিনিকেতনী ব্যাগে। অর্ঘ্যদাকে শার্টপ্যান্ট পরতে দেখিনি কখনো। সবসময়ই খদ্দরের পাঞ্জাবী আর ধুতি পরতেন। একজন বড় মাপের শিল্পী হয়েও খ্যাতির প্রতি অর্ঘ্যদার কোনো মোহ ছিল না। তাই তাঁর সান্নিধ্যে এসে আমার গতানুগতিক জীবনও বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের যে সব গান ছোটবেলায় শিখেছি কলকাতায় স্কুলের পরিবেশে, বাড়ীতে, অর্ঘ্যদার কাছে বা রেডিওর মাধ্যমে জীবনের পথে চলতে চলতে একটু একটু করে সে সব গানের গভীর অর্থ বুঝতে চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে অনেক গানই আমার কাছে সঞ্জীবনী সুধার মতো। এইরকম কয়েকটি গান হলো ,"যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয় ,/সবারে আমি নমি। ", "অল্প লইয়া থাকি ,তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়। ","অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো /সেই তো তোমার আলো !/সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো /সেই তো তোমার ভালো।" এইসব গান শুনতে শুনতে আর গাইতে গাইতে কবে যেন রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে আমার একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেছে। তাই আজ ফিরে ফিরে যাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাছে। সে গান আমার কাছে অমৃতবাণীর মতো। এই অমৃতবাণীর স্পর্শে ঘুচে যায় নয়নের কালো। হৃদয়ের আকাশে ফুটে ওঠে নতুন নতুন তারা,-আমার চলার পথের আলোর দিশারী।

"অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, (প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও ধর্তব্য) এঁদের প্রথম দিককার কবিতা পড়লেই বোঝা যায়, ওঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্র-সমুদ্রে স্নান করে তারপর নিজস্ব কলম ধরেছেন। ---- আম্ভরী নীরদচন্দ্র বঙ্গ সংস্কৃতির অনেক স্রষ্টাকে যখন তখন বিষদাঁতে করলেও রবীন্দ্র অনুরাগী, রবীন্দ্রনাথের কবিতা গানের উদ্ধৃতি দিতে অকৃপণ। সৈয়দ মুজতবা আলী রবীন্দ্রাসান্নিধ্যে ধন্য, তাঁকে গুরুদেব বলে মেনেছেন, রবীন্দ্রাকাব্যে আপ্লুত। ভাষাবিদ ও পণ্ডিত সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রাকাব্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।"

– কবিতা কার জন্য / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দেব বন্দ্যোপাধ্যায়

বসন্ত

হয়তো তুমি কোনো এক বর্ষার ঢল
আমার কাঁচের নদী নির্বাক, অচল
বাঁধ ভেঙে এসো একা এই তীরে,
আহত আয়নার বুক চিরে
নৈঃশব্দ বেঁধে রেখো তবু, অবিচল

হয়তো তুমি বিয়োগের কোনো সুর
বিষণ্ন বেহাগে বাঁধা ঠুনকো সমুদ্দুর
পোড়ামাটি কবে ভিজে গেছে জলে
দুচোখ তাই স্পষ্ট, তোমার আদলে
মুক্তো কুড়িয়ে রেখো কিছু, অগোচর

হয়তো তুমি নিশ্চুপ, অতীতের কোনো বাঁকে
আমার ছুট সরলরেখায়, দিগন্তের ডাকে
তবু বসন্ত স্থির, তোমাকেই ঘিরে
ছুঁয়ে আসি তাই ফিরে ফিরে
অস্ফুটে, নির্জন কোনো কক্ষপথে

চিত্রশিল্পী – তনিমা বসু

দেব বন্দ্যোপাধ্যায় – পেশায় পদার্থবিদ্যার গবেশক, তবে যতটুকু সময়ের ফাঁকফোকর তাতে শুধু কবিতা নিয়ে ভাবনা চিন্তা আর সাহিত্যের ছাত্র হবার বাসনা । দেবের লেখা কিছু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । দেব সপরিবারে মিশিগানের বাসিন্দা ।

তনিমা বসু – চিত্রকর বাবার হাত ধরে রঙতুলির খেলনাপাতি। চিত্র কলার বিভিন্ন মাধ্যম নিয়ে পরীক্ষা করতে ভালবাসা জন্মেছে ছেলেবেলা থেকে। কর্ম সুত্রে সংখ্যাতাত্বিক। যুক্ত উত্তর আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ মিচিগানের সাথে। দুই মেয়ের সাথে রঙতুলি নিয়ে মেতে থাকা আর প্রকৃতির যোগাযোগ রাখা জীবনের মূলমন্ত্র ।

উদ্দালক ভরদ্বাজ

ইয়েসেনিন গ্রামে

ধুলোমাখা রাস্তার দুদিকে এক একটা ছোট্ট বসতির মত গ্রামগুলো ছড়ানো। নিরুত্তাপ, অকেজো, বেরঙ, একঘেয়ে। জমিগুলোও শুকনো; কোনও বাড়িরই বাগান নেই, দূরে জঙ্গলের ইশারাও চোখে পড়ে না বিশেষ। ভাঙ্গাচোরা, রোগা রোগা নড়বড়ে বেড়াগুলো শুধু জানান দিচ্ছে সীমানার। দু একটা বাড়ির জানালায় এবড়োখেবড়ো, কদাকার রঙের পোঁচ। রাস্তার মাঝখানে একটা শুয়োর পাম্পের গায়ে গা চুলকোচ্ছে। বীর দর্পে হেঁটে-যাওয়া হাঁসের দল এক যোগে মাথা ঘুরিয়ে দেখল পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সাইকেলের ছায়াটুকু। একই সঙ্গে আক্রমণাত্মক এবং উৎসাহী একটা সম্মিলিত প্যাঁক-ধ্বনিতে বাতাস মুখরিত করে আবার চলতে লাগল, যেমন চলছিল। ক্ষুধার্ত মুরগিগুলোও ঘুরে বেড়াচ্ছে; রাস্তায়, ইয়ার্ডে, ভীষণ ব্যস্ত, বেপরোয়া দানা খোঁজায়।

এমন কি কনস্টানটিনোভোর মূল মুদির দোকানটিও কেমন যেন মুরগিখানার মতই দেখতে। কৌটো-বন্দি, নুন-মাখানো হারিং মাছ, রকমারি কোম্পানির ভদকা, চ্যাটচ্যাটে, এক ধরনের সেদ্ধ করে বানানো মিষ্টি, যা, অন্তত পনের বছর আগেই লোকে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। গোল গোল কালো রুটির লোফ-গুলো, বাজারের রুটির চেয়ে অন্তত দুগুণ বেশী ভারি; দেখে মনে হয়, ছুরি নয়, কুড়ুল দিয়ে কাটতে হবে।

ইয়েসেনিনের মেসবাড়ির, মনমরা পার্টিশন দিয়ে ভাগ করা, টিনের তাকের মত ঘরগুলোকে ঘর না বলে বাক্স বলাই ভালো। বাইরে, দরমা দিয়ে ঘেরা ছোট্ট এক চিলতে বাগান। এক সময়ে এখানে একটা বাথ-হাউস ছিল, যার মধ্যে সার্জেই নিজেকে, অন্ধকারে বন্দি করে রেখে লিখতে শুরু করেছিল ওর প্রথম দিকের কবিতাগুলো। এদিকে আস্তাবল, আর বেড়ার ওপারে ঘোড়ার ঘাস খাওয়ার মাঠ।

এই গ্রামের চতুর্দিকে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আর দশটা গ্রামের সাথে কোনও তফাত নেই। লোকগুলোর মাথায় শুধু অন্নচিন্তা; কি করে ফসল ফলবে, কি করে দিন গুজরান হবে, কি করে পড়শির মন জুগিয়ে নিরুপদ্রবে বেঁচে থাকা, কোনমতে টিকে যাওয়া যায়, এ ছাড়া আর কোনও ভাবনার প্রয়োজনটাই বা কোথায়। "অথচ", আমি ভাবলাম ... একদিন ঐশ্বরিক আগুন এসে পুড়িয়েছিল এই নিরুৎসুক দেহাতের মাটি, আকাশ, দূরের অরণ্য এবং তার আশ্রয়ে বেঁচে থাকা পশুপাখির সংসার। এখনো যেন সেই আগুনের হল্কা এসে পুড়িয়ে দিচ্ছে গাল। ওকা নদীর ঢাল ধরে হাঁটতে হাঁটতে দূরের দিগন্তের সবুজ ইশারায় তাকিয়ে মনে হল, এই কি সেই খভোরস্তভের জঙ্গল, যার আগুন সার্জেই-এর বুকের কষ্টকে বার করে এনেছিল; "জঙ্গল ফেটে পড়ছে আজ বনমোরগের হাহাকার বিলাপে"।

এই কি সেই শান্তির নদী ওকা, আঁকাবাঁকা চলে যেত যে জলাজমির বুক চিরে? যার বুকে রোদের ঝিলিক দেখে সার্জেই লিখেছিল, "এক তাল সূর্যরশ্মি, যেন বিছনো খড়ের গাদা, জলের নিবিড়ে ..." ? কি অদ্ভুত প্রতিভা, ঈশ্বর ঢেলেছিলেন এই অকিঞ্চিৎকর কুটিরের চঞ্চল, উগ্রস্বভাব গ্রাম্য বালকের বুকে, যে ওই দুঃসহ শহরতলির ঘিঞ্জি খোঁয়াড়ে, নিভন্ত উনুনের ছাইগাদায়, নির্মম, নির্মোহ, শুকনো ঘাসের প্রান্তরেও সে দেখতে পেল এত রূপ; যেই রূপ, হাজার বছর ধরে অবজ্ঞায়, অনাদরে মাড়িয়ে চলে গেছে কোটি মানুষের ভিড়!

In Yesenin Country – Solzhenitsyn

Four monotonous villages strung out one after another along the road. No gardens, and no woods nearby. Rickety fences. Here and there some garishly painted shutters. A

pig scratching itself against the pump in the middle of the road. As the shadow of a bicycle flashes past them, a flock of geese in single file turn their heads in unison and give it a cheerfully aggressive honk. Chickens scratch busily in the roadway and the yards, searching for food.

Even the village general store of Konstantinovo looks like a rickety henhouse. Salted herrings. Several brands of vodka. Sticky boiled sweets of a kind people stopped eating fifteen years ago. Round loaves of black bread, twice as heavy as the ones you buy in town, looking as if they are meant to be sliced with an axe rather than a knife.

Inside the Yesenins' cottage, wretched little partitions that do not reach the ceiling divide it up into what are more like cupboards or loose boxes than rooms. Outside is a little fenced-in yard; here there used to be a bathhouse where Sergey would shut himself in the dark and compose his first poems. Beyond the fence is the usual little paddock.

I walked around this village, which is exactly like so many others, where the villagers' main concerns are still the crops, how to make money, how to keep up with the neighbours, and I am moved: the divine fire once scorched this piece of countryside and I can feel it burning my cheeks to this day. Walking along the steep banks of the Oka, I stare in the distance with wonderment – was it really that far-off strip of Khvorostov wood which inspired the evocative line:

The forest clamorous with a wood-grouse's lament…

And is this the same peaceful Oka, meandering through water meadows, of which he wrote:

Hayricks of sun stacked in the waters' depth…

What a thunderbolt of talent the Creator must have hurled into that cottage, into the heart of that quick-tempered country boy, for the shock of it to have opened his eyes to so much beauty - by the stove, in the pigsty, on the threshing floor, in the fields; beauty which for a thousand years others had simply trampled on and ignored.

মৃত কবির স্ত্রী-কে দেখতে গিয়ে

"যেখানে হাত রাখো
শুধু কাগজ আর বই।
কিছু অসমাপ্ত কবিতা
ছড়ানো এদিক ওদিক –
কিছু সবেই হয়েছে শেষ;
ঝকঝকে নতুন
প্রথম স্বপ্নের মত।
কবিতায় তো সব ছিল,
সব টুকু ... না ?"

“একটা কবিতায় আকাশ মলিন ...
একটা কবিতায় অদৃশ্য রাস্তা,
কখনো আসছে, কখনো যাচ্ছে,
ম্যাজিকের মত ...
এ ভাবেই কেটে গেল জীবন, জানো ?”
বললেন কবির স্ত্রী ।
ওর কথাগুলো যেন
ভেসে আসছিল, অনেক দূরের দেশ থেকে
আর হঠাৎ, ঢুকে ঢুকে পড়ছিল শুন্য ঘরটায় ।

একটা বই দেখালেন, এর পর উনি ।
মলাট খোলা, পড়ে ছিল টেবিলে ...
কবি এই বই ছুঁয়ে ছিলেন
শেষ বার, এই বই ফেলেই
চলে গেলেন ।

“জানো,
ঠিক ওই জায়গাটায়
বসেছিল ও ।
পড়ছিল বইটা ...
বসে থাকতে থাকতে
হঠাৎ দেখলাম, পড়ে গেল বইটা হাত থেকে –
ব্যাস, সব শেষ ...”

বলতে বলতে দুহাতে
মুখ ঢেকে ফেললেন উনি ।
ভেসে যাওয়া ক্লান্ত মেঘের ছায়ায়
হারিয়ে গেলেন যেন –
গ্রহণের সূর্যের মত ।

Visiting the Beloved Wife of a Dead Poet

‘Papers, books’ she said ‘wherever I lay my hand.
A few half-finished poems, another somehow or other
complete. It was all there in the poems, wasn’t it?

In one the sky grew pale, in others a street
came and went.
That was how we spent our lives.'

Her voice,
as if coming from far away, faltered,
and then moved on in the quiet room. Then
she showed us a book that lay open on the desk
which the poet had touched, left for the last time.

'He sat there, reading this book,
and then we saw it slip from his hand.
That was all.'
And that's what she said, her face
behind her hands, as if eclipsed
by the shadow of a passing cloud.

নোবেল-জয়ী (১৯৭০) রুশ সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও কবি আলেক্সান্দ্র সলজেনিৎসিনের In Yesenin Country (ইংরেজি অনুবাদ) লেখাটি আপাতদৃষ্টিতে গদ্য মনে হলেও, ভাবে ও প্রস্তাবনায় একটি কবিতাই। এবং সে কবিতাও আসলে আর এক কবির প্রেরণার উৎস সন্ধানের ঔৎসুক্যে উজ্জ্বল। প্রত্যহের তাড়নায়, জীবন ধারণের সংগ্রামী পথের আলো-আঁধারে, যখন আর কেউ দেখে না জীবনের লুকনো জৌলুশ, কবি তার মনের আয়নায় পেয়ে যান রূপের সেই নিবিড় আখর। শব্দ হয়ে ঝরে পড়ে সেই সুর, কবিতার নরম শরীরে। আত্মহারা কবি একাত্ম হন জীবনের চিরন্তন ধারাজলে। শান্তির সেই সুধা অন্বেষণে, জীবনের পথে, প্রত্যেক পদক্ষেপে, কবিতা খুঁজতে খুঁজতে এক দিন কবিতাই হয়ে যায় জীবন। তখন কবিতার কল্পনাই হয়ে ওঠে বাস্তব। জীবনের জান্তব ঋণের থেকে দূরে, মানুষের পৃথিবীর নির্মমতার থেকে দূরে, সেই কল্পরাজ্যই তখন এক মাত্র আশ্রয়। কবির কবিতার অনুরাগিণী নারীও কবিতাকে ভালো বাসতে বাসতে, একদিন কবিতার আড়ালের মানুষটিকে ভালবেসে ফেলেন। তখন আর আলাদা করে দেখা যায় না কবি আর তাঁর সৃষ্টিকে। কবির মৃত্যু তাই কবির প্রেমিকার কাছে অসহনীয়। কবির মৃত্যু মানে যে কবিতার মৃত্যু। আর কবিতা ছাড়া কি করে বাঁচতে হয়, সে তো ভুলে গেছেন তিনি। সেই অসহায়তা এক অদ্ভুত জীবন্ত বর্ণনায় ফুটে ওঠে তুর্কী কবি ইলহান বার্কের Visiting the Beloved Wife of a Dead Poet (ইংরেজি অনুবাদ) কবিতায়। আমাদের প্রিয় কবির জন্মজয়ন্তী সংখ্যার জন্যে তাই বেছে নিলাম, কবি ও কবিতা সম্বন্ধীয় এই দুটি কবিতার অনুবাদ।

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ ক্যান্সার বিষয়ে গবেষণায় রত উদ্দালক অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাস বন্ধু, দুকূল, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, বাতায়ন ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

সুজয় দত্ত

রবিন কুক

না, এই লেখাটা ডজন তিনেক রোমহর্ষক পেপারব্যাকের লেখক সেই জনপ্রিয় আমেরিকান ঔপন্যাসিককে নিয়ে নয়, যিনি আবার একজন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবেও সুপরিচিত। যদিও তিনি জন্মেছিলেন মে মাসেই, পঁচিশে বৈশাখের দিন-চারেক আগে। আসলে ওঁর নামের সঙ্গে আমাদের জোড়াসাঁকোর নোবেল লরিয়েটের নাম আমার স্মৃতিতে একসঙ্গে জড়িয়ে যাওরার কারণ বছর পঁয়ত্রিশ আগের একটা ঘটনা। আমি তখন বয়ঃসন্ধিতে। ক্লাস এইট্। আমার মাসতুতো দিদি কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে। ইংরেজী-বাংলা-পল্ সায়েন্স কম্বিনেশন। কলকাতার যেকোনো কলেজে পড়াশোনার বাইরে যে-সমস্ত খেলা চলে, তার স্বাদ ও পেতে শুরু করেছে। ছাত্রসংগঠনের ঝান্ডা নিয়ে পথে পথে মিছিল, সেই একই ঝান্ডাধারী কিন্তু বিপরীত লিঙ্গের কারো কারো সঙ্গে কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে নিরালায় বসে আন্ডাভাজা আর ঠান্ডা পানীয় খাওয়া — সবই চলেছে প্রকাশ্যে অথবা লুকিয়ে। এমনিতে বাংলার চেয়ে ইংরেজী সাহিত্যে বা চলচ্চিত্রে ওর আগ্রহ বরাবরই একটু বেশী। আর ছোট থেকেই যথাসম্ভব কম পড়ে পরীক্ষায় যথাসম্ভব বেশী নম্বর পাওয়ায় ওর মনে কলেজজীবনেও এই আত্মবিশ্বাসটা কাজ করত যে ওর 'সাবান-ঘষা' মাথা — ফাঁকি দিলেও ক্ষতি নেই। আমার মেসোমশাই আবার পড়াশোনায় ফাঁকি একদম বরদাস্ত করতে পারতেন না। তো, আমার দিদির সেকেন্ড ইয়ারের বাংলা পরীক্ষার আর সাত দিনও বাকী নেই। ওর তো যথারীতি প্রিপারেশন হয়নি, সকাল থেকে নিজের ঘরের বিছানায় বালিশ ঠেসান দিয়ে বসে নোট নিয়ে ঘেঁতিয়ে যাচ্ছে। আমি সেদিন কি যেন একটা কারণে মাসীর বাড়ীতেই ছিলাম, আমিও বুঝতে পারছি ওর মন বসছে না। কিন্তু কেন বসছে না সেটা বোঝার মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টি তখনো আমার হয়নি। সেটা ধরা পড়ল মেসোমশাইয়ের অভিজ্ঞ চোখে। 'ঘরে বাইরে' আর 'চার অধ্যায়ের' নোটের তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে উনি কলেজস্ট্রীট থেকে সদ্য কেনা রবিন্ কুকের নতুন রোমাঞ্চ উপন্যাস 'হার্মফুল ইন্টেন্ট' পড়ছেন ! গোটা চারেক অধ্যায়ও বোধহয় শেষ করে ফেলেছেন। এই অবস্থায় হাতেনাতে ধরা পড়ে মেসোমশাইয়ের অগ্নিমূর্তির সামনে পড়তে যাবে, ঠিক সেই সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ আর এক সৌম্যমূর্তি যুবকের প্রবেশ। গালে হাল্কা দাড়ি, সপ্রতিভ, চোখেমুখে ইন্টেলেকচুয়াল ভাব — যেন উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে এখুনি একটা লেক্চার দিতে পারে, অথচ পোশাক-আশাক বেশ সাধারণ। স্বপ্নীল-দাকে সেই আমার প্রথম দেখা। স্বপ্নীল দাশগুপ্ত। আমার হবু জামাইবাবু। সেদিন অবশ্য বুঝিনি ঠিক কার সঙ্গে কী পরিচিতির ভিত্তিতে ও ঐ বাড়ীতে এসেছে, কারণ তখনও ওদের সম্পর্ক অতটা ঘনিষ্ঠ হয়নি। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই ও আমার মন জয় করেছিল — এটুকু বলতে পারি। মেসোমশাইয়ের মুখে দিদির কীর্তি শুনে হাহা করে হেসে উঠে বলেছিল, ''কাকু, মিথ্যেই ওকে বকছেন। রবিন্ তো রবীন্দ্রনাথেরই অ্যাব্রিভিয়েশন্, আর কুক্ মানে রাঁধুনী, অর্থাৎ ঠাকুর। ও তো পরীক্ষার পড়াই করছে।''

ছেলেবেলায় আমরা কচিকাঁচার দল নিজেদের মধ্যে আড়ি-আড়ি ভাব-ভাব খেলতাম। তাছাড়া আমার সেই সময়কার এক পাড়াতুতো বন্ধুর জ্যাঠামশাই রীতিমতো কবিতা-টবিতা লিখতেন, কবিমহলে পরিচিতিও ছিল। আমরা বিকেলে খেলার সময় দল বেঁধে হইহই করতে করতে ওদের বাড়ীতে ঢুকে পড়লেই ওর মা বকুনি দিতেন, ''অ্যাই, তোরা যা এখান থেকে ! মানুষটার সবে একটু ভাব এসেছে, নিরিবিলিতে লিখতে বসেছেন, আর এখন বাড়িতে এই দক্ষযজ্ঞ ?''। তো এই 'ভাব' জিনিসটাকে যে আবার 'সম্প্রসারণ' করা যায়, সেটা ক্লাস নাইনের বাংলা সিলেবাস হাতে পাওয়ার আগে বুঝিনি। তার আগে ক্লাস এইটে পদার্থবিজ্ঞানে গ্যাসের সম্প্রসারণ নিয়ে বয়েল্স্ আর চার্ল্সের সূত্র পড়েছি, জানি একটা বেলুনের মধ্যে গ্যাস ভরলে কোন্ আংকিক নিয়মে তা সম্প্রসারিত হয়। কি জানি, 'ভাব'কে সম্প্রসারণ করতে গেলেও হয়তো তার মধ্যে কিঞ্চিৎ 'গ্যাস' ভরতে হবে। যাইহোক, আমাদের বাংলা টিচার ছিলেন কড়া, এসব ব্যাপারে ইয়ার্কি-ফাজলামি একেবারেই বরদাস্ত করতেন না। তাই ''রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম / ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম'' কবিতাটির ভাব সম্প্রসারণ করতে বললেন যেদিন, আমার এক অমনোযোগী, অনিচ্ছুক সহপাঠী 'দেব' আর 'দেবো'র তফাৎ বুঝতে না

পেরে ''স্যার, রথ আর পথ কী দেওয়ার কথা বলছে স্যার ?'' জিজ্ঞেস করতেই উনি মুখ ভেংচে ''নীল্‌ডাউন করে দেওয়ার কথা বলছে স্যার ! যা, বেরো ক্লাস থেকে'' বলে ওকে বাইরের করিডোরে নীল্‌ডাউন করে দিলেন । এভাবেই আমার প্রথম পরিচয় রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতার 'কণিকা' পর্যায়টির সঙ্গে, যেখানে এরকম ভাব সম্প্রসারণ করার মতো টুকরো টুকরো মণিমাণিক্য আরো অনেক রয়েছে । এর পর তারা আমার জীবনে ফিরে ফিরে এসেছে নানা মজার ঘটনার মধ্যে দিয়ে ।

দুটো সেরকম ঘটনা মনে পড়ছে স্মৃতির সিন্দুক হাতড়াতে গিয়ে । আমার ছোটবেলার ফ্ল্যাট্‌বাড়ীর পাড়ায় এক অবিবাহিতা ভদ্রমহিলা আর তাঁর দাদা দুটো আলাদা আলাদা ফ্ল্যাটে থাকতেন, কারণ দুজনেই ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরে । মহিলার নাম শিখা দাস আর তাঁর দাদার নাম প্রদীপ । আমরা বলতাম শিখাপিসী আর প্রদীপজ্যেঠু । দুজনে একেবারে বিপরীত চরিত্রের – বোন যেমন কলহপ্রিয় আর মুখরা, দাদা তেমনি শান্তিপ্রিয় আর মাটির মানুষ । একই বিল্ডিং-এর দোতলা আর তিনতলায় ওঁদের ফ্ল্যাটদুটো – একে অন্যের ঠিক নীচে । নিজের বৌদির সঙ্গে শিখাপিসীর সম্পর্ক যে আদায়-কাঁচকলায়, সেটা পাড়াপ্রতিবেশীর জানতে বাকী থাকত না নানা ছুতোনাতায় ওঁদের নিত্তনৈমিত্তিক ঝগড়ায় । ঠিকে কাজের লোক কার কাজ আগে সারবে, কার র‍্যাশন্‌কার্ডের বাড়তি কেরোসিনটা কে কোন্ সপ্তাহে নেবে, কার ফ্ল্যাটের বাথ্‌রুমের জল চুঁইয়ে কার দেওয়ালে ড্যাম্প্ লাগছে, ইত্যাদি ইত্যাদি । উচ্চস্বরের সেই বাদানুবাদে থাকত ''আমার মায়ের পেটের বোন হলে কবে গলাটা টিপে দিতাম'' বা ''ভাই বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে'' ইত্যাদি তীব্র বিষোদ্‌গার । আমরা ছোটরাও সব শুনতাম, যদিও খুব একটা বুঝতাম না । তবে একটা জিনিস জানতাম – বছরের কয়েকটা বিশেষ সময়ে প্রদীপজ্যেঠুকে 'ভাই' বলে পরিচয় দিতে শিখাপিসীর লজ্জা করে না । যেমন সরস্বতী পূজো বা কালীপূজোর চাঁদা দেওয়ার সময় । আমরা দরজায় কড়া নেড়ে চাইতে গেলেই ''অ্যাই, একই ফ্যামিলি থেকে দুবার চাঁদা নিবি ? একটু আগেই আমার দাদার কাছ থেকে নিলি না ?'' এর কয়েকবছর বাদে যখন ক্লাস নাইনের রচনা-ব্যাকরণ বইয়ের ভাব সম্প্রসারণ অধ্যায়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম ''কেরোসিন-শিখা কহে মাটির প্রদীপে / 'ভাই' বলে ডাক যদি, দেব গলা টিপে / হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা / কেরোসিন শিখা বলে, এসো মোর দাদা', বলাই বাহুল্য অনেকক্ষণ হেসেছিলাম সেদিন । এমন মিলও সম্ভব !

আর একবার আমার মামাবাড়ীর (যেটা আমাদের ফ্ল্যাটের খুব কাছে হওয়ায় আমি ছোটবেলায় স্কুল থেকে ফিরে রোজ ওখানে অনেকক্ষণ কাটাতাম) পাশের পাড়ায় পুকুরের ধারে গাঙ্গুলীবাগানের মাঠে রাবারের বলে ক্রিকেট খেলতে খেলতে একটা ক্যাচ্ নিয়ে তুমুল বচসা – সেটা ব্যাটে লেগেছে না লাগেনি । পরিস্থিতি ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে বেধে গেল হাতাহাতি । আমাদের উইকেটকীপার কালুকে আমাদের বিপক্ষের ক্যাপ্টেন বড়সড় চেহারার লিটন এমন ধাক্কা দিল যে সে-বেচারা ছিটকে গিয়ে পড়ল পুকুরে । সাঁতার জানেনা, কোনোরকমে আঁকুপাঁকু করে হাত-পা ছুঁড়ে মাথাটা জলের ওপর তুলে রেখেছে আর পরিত্রাহী চীৎকার করে লিটনের নামে নালিশ জানিয়ে যাচ্ছে । কালু গাঙ্গুলীবাড়িরই ছেলে, তাই সেই চীৎকার শুনে ওর মা, বাবা, কাকা, দাদা সবাই বেরিয়ে এসে লিটনকে না পেয়ে (কারণ সে ততক্ষণে বিপদ বুঝে চম্পট দিয়েছে) আমাদের শাসন করতে শুরু করলেন । শেষমেষ কালু জল থেকে উদ্ধার পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীমুখো হল আর আমাদের সেদিনের খেলায় যবনিকা পড়ল । কিছুদিন পরে আমার মামাবাড়ীর এক কুলুঙ্গিতে রাখা একগাদা পুরনো জিনিসপত্রের মধ্যে থেকে আমার বড়মাসীর নিজের হাতে করা একটা এম্‌ব্রয়ডারী বেরোল, তাতে লেখা ''শৈবাল দিঘীরে বলে উচ্চ করি শির / লিখে রেখো, একফোঁটা দিলেম শিশির''। তখন তো আর জানিনা কোন্ কবির কোন্ বইয়ে আছে ওটা, শুধু এটুকু মনে ছিল যে কালুর ভালনাম শৈবাল গাঙ্গুলি আর লিটনের শিশির ঘোষ । মনে মনে লাইনদুটো আপনা থেকেই বদলে হয়ে গেল, ''শৈবাল দিঘীতে ভাসে উচ্চ করি শির / বলে 'দেখো, এক ঠেলা দিয়েছে শিশির'।'' এমন মজা কি আর রোজ রোজ হয় ?

না, ভুল বললাম, 'কণিকা'-সংক্রান্ত সব ঘটনাই ঠিক মজার নয় । কোনোটা কোনোটা যন্ত্রণাদায়কও বটে । যেমন ''যথাসাধ্য ভাল' বলে – ওগো 'আরো ভাল', কোন্ স্বর্গপুরী তুমি করে থাকো আলো ?'' স্কুলে থাকতে এটা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি । না, কোনো 'অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষার' কারণে নয়, আমার দিদিমণি আর মাস্টারমশাইদের প্রশংসা আর নম্বরের ব্যাপারে অবিশ্বাস্য অনুদারতার জন্য । প্রথম প্রথম মনে বিরক্তি জেগেছে । পরে জীবন আমায়

শিখিয়েছে সেই চির-অধরা 'আরো ভাল'র পিছনে নিরন্তর ধাওয়া করে চলার আসল মূল্য । আমাদের স্কুলে ক্লাস ওয়ান থেকে সিক্স ছিল প্রাথমিক বিভাগ আর সেভেন থেকে মাধ্যমিক । প্রাথমিক বিভাগের শেষ পাঁচবছর প্রতিটি পরীক্ষায় আমি প্রথম হওয়ার পুরস্কার পেয়েছি । কিন্তু কতগুলো ব্যাপার আমাকে অবাক করত । প্রথমতঃ, অংকে বা বিজ্ঞানে ফুল মার্কস্ পাওয়া গেলেও বাংলায়-ইংরেজীতে কিছুতেই পাওয়া যায়না । বাংলা রচনায় হয়তো বাসন্তীদি মন্তব্য লিখেছেন ''খুব ভাল'' কিন্তু দিয়েছেন কুড়িতে ষোল কি সতেরো । ইংরেজী ট্রান্সলেশনে হয়তো শোভনাদি বড় করে রাইট্ দিয়েছেন, কিন্তু নম্বরের বেলায় দশে আট । কেন রে বাবা ? দ্বিতীয়তঃ, ডিসেম্বর মাসে শীতের ছুটির ঠিক আগে রেজাল্ট বেরোনোর দিন আমার একহাতে ফার্স্ট প্রাইজ আর অন্যহাতে অবধারিতভাবে রেজাল্ট কার্ডে বড়দি-র লালকালিতে লেখা মন্তব্য ''আরো ভাল করা উচিত ছিল''। মহা মুশকিল তো ! ফার্স্টের চেয়েও ভাল-টা ঠিক কী ? মোট নম্বরের শতাংশ বাড়াতে হবে ? বেশ, পঞ্চম আর ষষ্ঠ শ্রেণীর চারটে পরীক্ষায় আমার মোট নম্বর বাড়তে বাড়তে একাশি থেকে বিরানব্বই শতাংশ । তা সত্ত্বেও ষষ্ঠ শ্রেণীর অ্যানুয়াল পরীক্ষা-শেষে আমার রেজাল্টে বড়দি লিখলেন, ''আরো পরিশ্রম করতে হবে, আরো উন্নতির চেষ্টা করতে হবে ।'' আমি অবাক ! এরপর বছর ঘুরল, সকালের ক্লাসের পর্ব শেষ হয়ে আমাদের এবার বেলা এগারোটায় ক্লাস শুরু, এবং আর 'দিদিমণি' নয়, 'স্যার' । ক্লাস সেভেনে বেশ কিছু নতুন ছাত্র ভর্তি হল, তার মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন আর পাঠভবনের মতো নামী স্কুল থেকে আসা কয়েকজনও ছিল । অচিরেই দেখলাম, এই নতুনদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমি দ্বিতীয় হতে শুরু করেছি, এমনকী কয়েকবার তৃতীয়ও । বুঝলাম 'আরো ভাল' নামক আলেয়াটির পিছনে ক্রমাগত ছুটে চলার আসল মানে হল আত্মতুষ্টিতে না ভুগে জীবনের হঠাৎ-ছুঁড়ে-দেওয়া কঠিনতর চ্যালেঞ্জগুলোর জন্য নিজেকে সদাপ্রস্তুত রাখা ।

এই মাধ্যমিক বিভাগে থাকাকালীন দেখতাম আমাদের স্কুলে প্রতিবছরই কিছু নতুন মুখ কয়েক সপ্তাহের জন্য পড়াতে আসেন । পরে জেনেছিলাম এঁরা বি এড্ পড়ছেন, বিভিন্ন স্কুলে যান শিক্ষকতার 'প্র্যাক্টিকাল ট্রেনিং' বা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নিতে । এঁদের অনেকের সঙ্গে আমাদের বেশ ভাব জমে যেত, ক্লাসে নানারকম গল্প-টল্প শোনাতেন । এঁদের মধ্যে একজন, বাংলার টীচার বিষ্ণুপদ দত্ত, ছিলেন খুব রসিক । একবার বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ক্লাসে ''উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে / তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে''র মানে বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, যে অধম তাকে ধরে উত্তমমধ্যম দিতে হয়, আর সেই ভয়ে সে তফাতে তফাতে চলে । ভদ্রলোক বেশ ভাল ছবিও আঁকতেন । তা, এহেন বিষ্ণুবাবু একদিন একটা অদ্ভুত হোম্টাস্ক দিয়েছিলেন । জনৈক কবির কোনো এক কবিতা অবলম্বনে তিনি একটি গল্প বলবেন । আমাদের খুঁজে বার করতে হবে কবি ও কাব্যগ্রন্থের নাম, পরদিন ক্লাসে বলতে হবে । পারলে লোভনীয় পুরস্কার ওঁর নিজের হাতে আঁকা একটি স্কেচ্ । গল্পটা হল, ওঁদের শহরতলীর বাড়ীতে নাকি বড় করে দুর্গাপূজো হয় । একবার পূজোর সময় ষষ্ঠীর দিন থেকে প্রচন্ড বৃষ্টি । দুটো গাড়ী ভোর-ভোর বেরিয়ে গেছে বৌবাজার থেকে ফুল আর পোস্তাবাজারে ফলের আড়ৎদারের কাছ থেকে ফল আনতে । ফুলের গাড়ীতে ছিলেন উনি নিজে, অনেকক্ষণ ধরে পূজোর সকালের যানজট আর বৃষ্টিবাদলা সামলে ফিরে দেখেন ফলের গাড়ী তখনো বেপাত্তা । সে-সময়ে তো আর মোবাইল ছিলনা যে ''তোরা এখন কোথায় ?'' বলে একটা ফোন করলেই সব সমস্যার সমাধান । বেশ খানিকক্ষণ ধরে অপেক্ষা আর অস্থির পায়চারীর পর ওঁরা পোস্তাবাজারের সেই আড়ৎদারকে তার ল্যান্ডলাইনে ফোন করে জানলেন অন্য গাড়ীটা বহু আগেই ফল নিয়ে রওনা হয়েছে । এবার তো আরো বেশী দুশ্চিন্তা — এত ভীষণ দেরীর কারণটা ঠিক কী ? শেষে ঘড়ির কাঁটা যখন বারোটা ছুঁইছুঁই, ওঁরা আর থাকতে না পেরে গাড়ীদুটো যেখান খেকে ভাড়া কারা হয়েছিল সেখানে গিয়ে দেখেন অন্য গাড়ীটা দিব্যি দাঁড়িয়ে রয়েছে । রেগেমেগে সেই গাড়ীর ড্রাইভারকে তলব করে খানিক হম্বিতম্বি করতে সে বলল, ''আরে এত চেঁচাচ্ছেন কেন ? ফলটল তো সব আপনাদের ভ্যানের পেছনেই রয়েছে । দেখেননি খুলে ? ফুলের প্যাকেটগুলোর ভেতরে ভেতরেই তো ফলের থলিগুলো গুঁজে দিয়েছি আমি । ফেরার পথে মধ্যমগ্রামে আপনারা যখন গাড়ী থামিয়ে চা খাচ্ছিলেন, আমিও থেমেছিলাম ওখানে । দেখলাম আপনাদের ভ্যানের পেছনটা খোলা, তাই আমার মালগুলো ওতে ট্রান্সফার করে দিলাম । তারপর আমি একটু টয়লেটে গেছিলাম, ফিরে দেখি আপনারা হাওয়া — তাই আর বলতে পারিনি ।'' তার মানে এতক্ষণ ফুলের মধ্যেই ফল ছিল ! বিষ্ণুবাবুরা স্রেফ ভ্যানের পেছনটা খুলে দেখেননি বলে এই কান্ড ! যাইহোক, এই গল্প-ধাঁধাঁর সমাধান পরদিন সারা

ক্লাসে করতে পেরেছিল দুটিমাত্র ছেলে। নিজেরাই পেরেছিল না বাড়ীর লোকের সাহায্যে — সেটা বলা মুশকিল। দুজনেই পুরস্কার পেয়েছিল বিষ্ণুবাবুর আঁকা রবীন্দ্রনাথের যুবক বয়সের একটি করে স্কেচ্। কবিতাটি অবশ্যই 'কণিকার' ''ফুল কহে ফুকারিয়া — ফল, ওরে ফল, / কত দূরে রয়েছিস বল মোরে বল / ফল কহে, মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি ? / তোমারই অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি।''

ফুলের অন্য নাম যেহেতু কুসুম, এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল আমার বাবার অফিসে এক সহকর্মীর কথা। সত্যেনকাকু। অসাধারণ ফোটোগ্রাফির হাত ছিল ভদ্রলোকের। সেই সময়কার আগ্‌ফা ক্লিক্ থ্রি, ইয়াশিকা আর আসাহি পেন্ট্যাক্স ক্যামেরায় দারুণ দারুণ সব সাদাকালো ছবি তুলতেন। শুধু তুলতেন না, সেগুলো আবার ডেভেলপ্ করে, ক্যাপ্‌শন-সহ ফ্রেমে বাঁধিয়ে বিক্রী করতেন। এমনিতে ওঁর মধ্যে একটা স্বভাবসিদ্ধ 'মজারু' ছিল, খুব হাসাতে পারতেন। হয়তো ওঁদের বাড়ীতে গেছি, উনি রেডিওতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান শুনছেন। হঠাৎ ওঁর স্ত্রী, মানে পূর্ণিমা কাকিমা, এসে রেডিওর টিউনারটা ঘুরিয়ে অন্য স্টেশন করে দিলেন যেখানে হয়তো তখন বসন্ত চৌধুরীর আবৃত্তি হচ্ছে। উনি বিরক্ত না হয়ে মুচকি হেসে গেয়ে উঠবেন, ''হেমন্তে কোন্ বসন্তেরই বাণী / পূর্ণশশী ঐ যে দিল আনি।'' ওঁদের একটা ছোট্ট মেয়ে ছিল, ভালনাম অরুণিমা আর ডাকনাম শাটার। বোঝাই যাচ্ছে কোন্‌টা কার দেওয়া। আমরা ওঁদের বাড়ীতে গিয়ে যখন গল্প করতাম, শাটার তখন ওর খেলাঘরে নিজের মনেই খেলত। একদিন গিয়ে দেখি দরজা খুলে ঢুকতেই সত্যেনকাকু মুখে আঙুল দিয়ে আমাদের নিঃশব্দ থাকতে বলছেন আর ওঁর হাতে ক্যামেরা। শাটারের খেলাঘরের দরজার আড়ালে উনি দাঁড়িয়ে, আর শাটার একটা জলে ভেজা নেকড়া দিয়ে ক্রমাগত কী যেন মুছে চলেছে। সারা ঘরের এবং বসবার ঘরের সাদা সিমেন্টের মেঝেতে ছোট্ট ছোট্ট হলুদ পায়ের ছাপ। পরে জানলাম আজ একটু সকাল-সকালই খেলাটেলা শেষ হয়ে গেছে মিস্ অরুণিমার, তাই রান্নাঘরে গিয়ে মা-র অলক্ষ্যে যেকটা ডিম ছিল সব ফাটিয়ে তার কুসুম দিয়ে মেঝেতে ছবি এঁকেছে। সেই কুসুমই ওর পায়ে পায়ে সারা বাড়ী ছড়িয়েছে। অন্য কেউ হলে নির্ঘাৎ চড়-থাপ্পড় পড়ত বাচ্চা মেয়েটার গালে। তার বদলে সত্যেনকাকু যা করলেন, সেটা এককথায় অপূর্ব। অনেকদিন আমাদের বাড়ীতে টাঙানো ছিল ওটা — উনিই উপহার দিয়েছিলেন বাবাকে। ওঁর মেয়ের সেদিনের সেই দুষ্টুমি ক্যামেরাবন্দী করে উনি ফ্রেমে বাঁধিয়েছিলেন। ক্যাপ্‌শন দিয়েছিলেন, ''কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও / শেষে দাও মুছে / ওগো চঞ্চল — বেলা না যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে ?''।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর হাস্যরসাত্মক রচনার জন্য নোবেল পুরস্কার পাননি ঠিকই, কিন্তু এ-গল্পে বর্ণিত ঘটনাবলীতে তাঁর বিভিন্ন কবিতার পংক্তি যে বিচিত্র অর্থ পেয়েছে, আশা করি তা পাঠকের কাছে রবীন্দ্ররচনার রসাস্বাদনের একটা উপভোগ্য দৃষ্টিকোণ। স্বয়ং কবিগুরুর রসবোধের কম আখ্যান তো ছড়িয়ে নেই লোকমুখে। শোনা যায় শরৎচন্দ্র একবার ঠাট্টা করে ওঁকে এক জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন যাতে শুধু লেখা ছিল ''আমি ভাল আছি''। তার উত্তরে কবিগুরু বড়সড় একটি পাথর যত্ন করে পার্সেলে মুড়ে শরৎচন্দ্রকে ডাকযোগে পাঠিয়েছিলেন, সঙ্গের চিঠিতে লিখেছিলেন ''আপনার কুশল জানিয়া আমার হৃদয় হইতে এই পাষাণভার নামিয়া গেল''।

সুজয় দত্ত — ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

‘আজি ঝড়ের রাতে’

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প একরাত্রি অবলম্বনে লেখা নাটিকা

লোকালয় থেকে কিছু দূরে গাছগাছালিময় জলমগ্ন পুকুরের পাড় । মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে । তার সঙ্গে থেকে থেকেই শোনা যাচ্ছে বাজের কড়কড় আওয়াজ । প্রবল তোড়ে জল বইছে । পুকুরপাড়ের নারকেল, সুপারি আর মাদার গাছের মাথা পাগলা হাওয়ায় উথালপাতাল । রাত্রি একটা প্রায় । চরাচর ছেয়ে আছে ঘন অন্ধকারে । পথঘাট জনশূন্য । পুকুরপাড়ের দুদিক থেকে দুজন পথিক জলঝড়ের দাপট সামলে চলেছে ।

নেপথ্যে গান:

‘তিমিরময় নিবিড় নিশা — নাহি রে নাহি দিশা —
একেলা ঘনঘোর পথে, — পান্থ কোথা যাও ।।
বিপদ দুখ নাহি জানো, — বাধা কিছু না মানো,
অন্ধকার হতেছ পার — কাহার সাড়া পাও ।।
দীপ হৃদয়ে জ্বলে, — নিবে না সে বায়ুবলে —
মহানন্দে নিরন্তর — একি গান গাও ।
সমুখে অভয় তব, — পশ্চাতে অভয়রব —
অন্তরে বাহিরে — কাহার মুখে চাও ।।’

গান শেষ হলে আবছা আলো মঞ্চে । অস্পষ্টতার মধ্যে বোঝা যাচ্ছে পথিকদের একজন নারী ও অন্যজন পুরুষ ।

সনাতন: কে ? কে ওখানে এই অন্ধকারে ? কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না যে!! মনে হয় কে যেন আসছে এই দিকে । পুকুরপাড় ধরে । সুরো ? নাকি নারকেল গাছের পাতার দুলুনি ? ডাকব ?

সুরবালা: আঃ ! এ যে প্রলয়ের অন্ধকার । পৃথিবীর সব দীপ গেছে নিভে । কি করি এখন ? কোন দিশা নেই । কে যেন এইদিকে আসছে মনে হচ্ছে । কিন্তু সেও কি সম্ভব ? এ ‘আমার প্রাণের গভীর গোপন, মহা আপন . . .।’

সনাতন: জলঝড়ের আওয়াজে গলার স্বর চাপা পড়ে যায় যে । তা যাক । ডাকার দরকারই বা কি ? এ চেহারা আমার ভুল হওয়ার নয় কোনমতে । আমার শৈশবের সখী সুরবালা, সুরো । একলা এই ঘনঘোর আঁধারে কোথায় চলেছে সে ? তবে কি সে আমার কাছে আসছে ? এও কি সম্ভব ? কিন্তু আমি ছাড়া এদিকে আর তো কেউ নেই তার জানাচেনা ।

সুরবালা: স্কুলবাড়ীর দিক থেকে আসছে যখন সনাতনদা’ই মনে হয় । অগ্নিকাণ্ডের থেকে বাঁচাতে স্কুলবাড়ীতে একজনকে থাকতে হয় । সে একা মানুষ । স্কুলবাড়ীতেই থাকে বলে শুনেছি । জল ক্রমশঃ বাড়ছে । রাত কটা হল কে জানে !

সনাতন: রাত তো কিছু কম হল না । এ দুর্যোগে সময়ের হিসেব রাখা দায় । বিকেল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে । সুরবালাকে কি বলব যে আমি তারই কথা ভেবে, তাকে স্কুলবাড়ীতে ডেকে নিয়ে আসব বলে এমন রাতে পথে বেরিয়েছি ? আমার আর কিছু চাই না । শুধু সে নিরাপদে থাক । সে আজ একেবারে একা যে ।

সুরবালা: কি ভীষণ তোড়ে জল ছুটে আসছে। এর মধ্যে সনাতনদা এই পুকুরপাড় ধরে কোথায় চলেছে ? তবে কি আমার জন্য . . . ? না না। তা কি করে হয় ? সে সেই কবে আমাকে ফেলে রেখে কলকাতায় চলে গিয়েছিল। আট বছরের আমি অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু সনাতনদা তো ফিরে আসেনি।

সনাতন: নিজের উপর নিজেরই রাগ হচ্ছে। এই সুরবালা আমার কি না হতে পারত ? আমার সবথেকে অন্তরঙ্গ, আমার জীবনের সুখদুঃখের সাথী — আমাকে ঘিরে থাকতে পারত। সে আজ এত দূর, এত পর। আজ তাকে দেখা নিষেধ, তার সঙ্গে কথা বলা দোষ, তার কথা চিন্তা করা পাপ। কিন্তু পারলাম কই ? এই বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে সে বাড়ীতে একা। এ কথা ভেবেই মন বড় উতলা হয়ে উঠল। এ কি পাপ ? তাহলে পুণ্য কি ?

সুরবালা: আমার কথা কি মনে পড়ল তাহলে ? এতদিন পরে ? এই আঁধার ঘেরা রাতে ? ঝড়বাদলের তাণ্ডবে ?

সনাতন: সেই কোন শিশুকালে সে ছিল আমার খেলার সাথী। একসঙ্গে পাঠশালায় গেছি। বউ বউ খেলেছি। তার মা আমাকে আর তাকে একসাথে করে বলতেন, 'আহা, দুটিতে বেশ মানায়।' ছোট হলেও সে কথার মানে বুঝতাম। আজ এই ভয়ঙ্কর রাতে, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আবার বুঝি আমরা মিলিত হলাম।

সুরবালা: হ্যাঁ। সনাতনদা'ই। আমি নিশ্চিৎ। এ চেহারা আমার মনের গভীরে আঁকা। বাইরের আলো লাগবে না এই মানুষটাকে চিনতে। অন্ধকার গভীর। ক্ষতি কি ? ঝড়ের দাপটে সোজা হয়ে দাঁড়ান দায়। বৃষ্টিতে জামাকাপড় ভিজে সপসপে। ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা নেই। মেঘের পরে মেঘ জমেছে আকাশে। এ কেমন মিলনলগ্ন ?

নেপথ্যে গান: 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে'

সনাতন: মিলন ? সুরাবালাও আমাকে চিনতে পেরেছে নিশ্চয়ই। তাই থমকে দাঁড়িয়েছে। এ জীবনে মিলন হবে না সখী। কোথা থেকে এক উকিল রামলোচন এসে কটা মুখস্থ মন্ত্র পড়ে তোমাকে পৃথিবীর আর সকলের কাছ থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। কিন্তু আমি মনে জানি তুমি রামলোচনের থেকে ঢের বেশী আমার। আমি সমাজ ভাঙতে চাই না। বাঁধন ছিঁড়তে চাই না। এ আমার অব্যক্ত মনের ভাব। মুখ ফুটে কোন কথা এখন বলতে পারছি না। শুধু এক অসহ্য আবেগ মাথা কুটে মরছে মনে।

সুরবালা: কিন্তু কেন ? তবে কি ছেলেবেলার সে মনের ভাবখানি আজও হৃদয়ে ফুলের মতো প্রস্ফুটিত ? শুকিয়ে যায় নি সে ফুল ? ঝরে পড়ে নি পাপড়ি ?

সনাতন: রামলোচনকে দোষ দিই না। সেই পনের বছর বয়সে কলকাতা গেলাম নাজির সেরেস্তাদার হতে। সেখানে গিয়ে গ্যারিবলডি, ম্যাৎসিনি হওয়ার আয়োজন করে বসলাম। দেশোদ্ধারের কাজে প্রাণ উৎসর্গ করব ভেবেছিলাম।

সুরবালা: আমার বয়স তখন এগার। সনাতনদা চলে যাওয়ার পরে কেটে গেছে তিন তিনটে বছর। বাবা-মা আমার বিয়ের বন্দোবস্ত পাকা করে ফেললেন।

সনাতন: কলকাতায় তিন তিনটে বছর কেটে গেল। নিয়মিত সভাসমিতিতে যোগ দিতাম। নেতারা বক্তৃতা দিতেন, আর আমরা চাঁদার খাতা নিয়ে না খেয়ে দুপুর রোদে টো টো করে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়াতাম। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপন বিলি করতাম। সভাস্থলে গিয়ে বেঞ্চি চৌকি সাজাতাম। দলপতির নামে কেউ একটা কথা বললে কোমর বেঁধে মারামারি করতে উদ্যত হতাম। শহরের ছেলেরা এইসব লক্ষ্মণ দেখে আমাদের বাঙাল বলত।

সুরবালা: আমি বিয়ে করতে চাই কিনা এ প্রশ্ন কারও মাথাতেই আসে নি। গ্রামদেশে এগার বছরের মেয়ে। তায় আবার সুন্দরী বলে আমার পরিচিতি ছিল। সহজেই পাত্রস্থ হলাম।

সনাতন: সুরবালার বিয়ের খবর কানে এসেছিল। তখন দেশোদ্ধারের নেশায় মত্ত আমি। ব্যস্ত ছিলাম চাঁদা আদায়ের কাজে। এ খবর ভারী তুচ্ছ বলে মনে হল।

সুরবালা: বিয়ের খবর পেয়েও তো কই সনাতনদা গ্রামে আসেনি। আমি ভেবেছিলাম ছেলেবেলার সেই বউ বউ খেলা একা আমার মনেই সত্যি।

সনাতন: বাবা মারা গেলেন। সংসারের হাল ধরতে কলেজ ছেড়ে কাজের খোঁজে বেরলাম। বাল্যসখীর কথা ভাবার অবকাশ কই ? তা সুরবালার স্বামী যে শহরের উকিল সে শহরেই এক এন্ট্রান্স স্কুলে যে আমার সেকেন্ড মাস্টারের চাকরি জুটবে তা কে জানত ?

সুরবালা: এ শহরে এসেও তো অনেকদিন পর্যন্ত সে খোঁজখবর করেনি আমার !

সনাতন: সুরবালার সঙ্গে যে কোনকালে আমার জীবন কোনভাবে জড়িয়ে ছিল একথা রামলোচনবাবুকে বলিনি। বলাটা সঙ্গত মনে হয়নি। আমার নিজের মনেও সে স্মৃতি কেমন যেন আবছা হয়ে এসেছিল। ছেলেদের নিয়ে দিন ভালই কাটছিল। ভেবেছিলাম উপদেশ আর উৎসাহ দিয়ে এক একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের সেনাপতি করে তুলব।

সুরবালা: আমার কথা মনেই পড়েনি তার। এ শহরে থেকেও তাই দূরে দূরে ছিল।

সনাতন: তারপর এক ছুটির দিনে গেলাম রামলোচনবাবুর বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বর্তমান ভারতের দুরবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা বেশ জমে উঠেছিল। পাশের ঘরে তখন চুড়ির মৃদু টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খসখস, পায়ের একটুখানি শব্দও যেন শুনলাম। না তাকিয়েও বেশ বুঝলাম দুটি কৌতুহলী চোখ জানালা দিয়ে আমাকে দেখছে। তখনি মনে পড়ে গেল টানা টানা মায়াভরা দুই চোখ। সহসা কে যেন আমার হৃৎপিন্ডটা কঠিন মুঠোয় চেপে ধরল। বেদনায় টনটন করে উঠল মন।

সুরবালা: কতদিনের পর জানালা দিয়ে ক্ষণকালের চোখাচোখি। বেশ বুঝলাম চাঁদের অলখ টানে সমুদ্রে যেমন জোয়ার ওঠে তার বুকেও তেমনি তুফান উঠেছে।

সনাতন: বাড়ী ফিরে লেখাপড়ায় আর মন বসে না। মনটা একটা বিরাট বোঝা হয়ে বুকের শিরা ধরে দুলতে লাগল। আমার সে সুরবালা কোথায় গেল ?

সুরবালা: খুব ইচ্ছে করছিল হাতদুটো ধরে শুধোই, 'কেমন আছ ?'

সনাতন: যাকে আমি ইচ্ছা করলেই পেতে পারতাম এখন মাথা খুঁড়ে মরলেও তাকে একবার চোখের দেখা দেখারও আমার অধিকার নেই। সেই শৈশবের সুরবালা আমার যত কাছেই থাক মাঝখানে বরাবর একটি দেওয়াল থাকবে। এ ভাবনা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। কোন কাজে মন দিতে পারি না আর। স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে পুকুরের ধারে বসে থাকি। নারকেল আর সুপারি পাতার মধ্যে দিয়ে বাতাস বয়ে চলে শিস তুলে। ভাবি আমাদের সমাজ এক জটিল ভুলের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করতে কারও মনে পড়ে না। তারপর বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা নিয়ে অস্থির হয়ে মরে।

সুরবালা: জল বেড়েই চলেছে। কেবল হাত পাঁচছয় এই দ্বীপের উপর আমরা দুটি মাত্র প্রাণী। ঘর ছেড়ে পথে। আঃ, বিদ্যুতের ঝলকানিতে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। আকাশে একটি তারাও জ্বলছে না।

সনাতন: রামলোচনবাবু মোকদ্দমার কাজে অন্যত্র গেছেন। সমুদ্রে বান ডেকেছে। সেও আজ বিশ্বসংসার ছেড়ে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ঘোর বিপদের সময় আমি ছাড়া তার আর কেউ নেই। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে করছে, 'কেমন আছ সুরো ?' সে আকুল হয়ে বলবে . . . । আজ কথা বললে ক্ষতি নেই।

গান: এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায় ।
এমন দিনে মন খোলা যায় –
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরোঝরে
তপনহীন ঘন তমসায় ।।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায় ।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায় –
এমন ঘনঘোর বরিষায় ।।

সুরবালা: বড় ভয় করছে ।

সনাতন: তোমার বোধহয় ভয় করছে সুরবালা । ভয় কিসের ? একটা ঢেউ শুধু ! আর একটা ঢেউ এলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু থেকে, বিচ্ছেদের এই বৃন্তটুকু থেকে খসে আমরা এক হয়ে যাব ।

সুরবালা: ভেসে যাক চেনা ঘর । রোজকার এই চেনা জীবন । আসুক ঢেউ । মারণ দোলায় দুলতে দুলতে হবে আমাদের বাসর ।

সনাতন: ঢেউ না আসুক । সুরবালা তার ঘর সংসার নিয়ে সুখে থাক । আমি এই এক রাতে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়িয়ে অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পেয়েছি ।

সুরবালা: যাক, রাত শেষ হয়ে আসছে । পুব আকাশে যেন আলোর আভা দেখছি । সনাতনদার সঙ্গে একটা কথাও বলা হল না যে । না হোক ! এক জন্মের নীরবতা কিছুই নয় ।

(নেপথ্যে ভোরের রাগে বাঁশি বাজছে)

সনাতন: ঝড় থেমে গেছে । জলও নামছে আস্তে আস্তে । সুরবালা বাড়ীর পথ ধরল । আমিও ঘরে যাই এবারে । আমি নাজির হইনি, সেরেস্তাদার হইনি, গ্যারিবলডিও হইনি । আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার । আমার ইহজীবনে ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হয়েছিল – আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে এই একটি রাতই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা ।

নেপথ্যে গান: ‘আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার ।
আকাশ কাঁদে হতাশসম, নাই যে ঘুম নয়নে মম –
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম, চাই যে বারে বার ।।
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই ।
সুদূর কোন্ নদীর পারে গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে হতেছ তুমি পার ।।’

Shubham Sanyal

Heave Ho!
Robi Thakoor's 'Khorobayou Boi Bege'

Winds are roaring at a great pace,
Clouds are covering heaven's face,
Won't you boatman steer away the boat oar?
You can man the hull out there,
While I pitch the sail our here
And let us both cry out, “Heave Ho! Heave Ho! Heave Ho!'

Hear the sound of clanking chain, ringing in tormented vein
This is not the rendering of the mighty ship's anguished pain!
Struggling hard to break the shackles of the iron bonds in vain
Rocking up the vessel from stern to bow!
Come on let us all cry out. “Heave Ho! Heave Ho! Heave Ho!'

Days and nights have passed on by
And you may be wondering why
“Should we steer ahead of return back?
But don't let your spirits stray
Fear and doubts will fade away
Move on with your will and just stay on track!

When there cometh the doomsday
Thundering clouds are on their way
Hurricanes are churning up the waves into a mighty sway!
Don't you fear, oh my dear, join the Nature's beat and pray
And certainly you shall the glimpse the VIBGYOR !
Come on let us all cry out. “Heave Ho! Heave Ho! Heave Ho!'

Shubham (Subrahmanya) Sanyal is an IT Program Manager based in Chicago. He graduated in Mechanical Engineering from IIT Delhi and passed MBA from the Delhi University. He moved to USA in 1997 and has been settled in Chicago since 1999. His passions include drama, literature and music. Shubham has directed and acted in multiple plays in Bengali, Hindi and English. He is an active member of Unmesh, the Bengali literary society in Chicago and has written several stories, poems, articles and published a book of Bengali comic stories called 'Time-Pass'.

Shubham Sanyal
The Hero
a Child's Fantasy
(Americanized adaptation of Rabindranath Thakur's 'Bir Purursh')

1. Imagine we are traveling through the day
With Mama to lands far away.
Mama with her knitting kit and fan
Sitting 'neath the Caravan roof
I'm on my trusty stallion 'Dan'
Sending up dust-smoke at each hoof !

2. The sun descends below the battered plain.
We emerge into a bleak terrain.
Boulders, bushes and cacti -
Nought but wilderness meets the eye.
So, Mama, you anxiously ask me,
“Koko son, tell me, where are we?”
Casually I reply, “Mamma dear,
Yonder flows the river, why fear?'

3. Thorny bushes dot the dusty ground.
Ahead we spy the pathway veering round.
No bird, no beast comes into our sight;
They're homebound with the onset of the night.
We know not now to which place we walk
For every thing ahs blurred out with the dark.
You call me and whisper to me then,
“What's that light I spy within the glen?'

4. Suddenly rings out a piercing yell.
Red Indians are riding down the dell !
Huddled in a corner of the cart
You pray to God with all your heart.
The drivers two who thought themselves too smart
Have disappeared in fear of their lives.
Assuring you I say, “It's okay Mom !
I'm still here with my two Colt 45's”

5. With bows, arrows, spears and tomahawks
Indians now are thundering down the rocks !
Furiously I cry out, “Hold on there !
Stop before it's late, or if you dare
Come nearer you shall not return!”
Yet they laugh and come without concern.

6. “Koko we must flee!” you plead to me.
I say, “Mom, just relax and see.”
With both guns drawn I ride to meet the 'Red'
Arrows now are whistling by my head
My guns spit fire, and fast one by one
They topple over, and then ….they're all gone!

7. By this time you've plunged in grief and dread
For you think that Koko's surely dead.
Suddenly from by your side you hear
“The fight is over. They're all gone, Mama dear.”
You jump out and in great ecstasy
Pull me to your bosom and kiss me,
Saying, “Dear, you *are* a worthy son!
A braver man I know not anyone!”

.....

8. So many things happen every day.
Why can't such a thing be true some day ?
Wouldn't that be a fabulous tale to tell?
Listeners would be bound as though in spell.
And Uncle Bob would tease me and say, “Waaal,
Koko is not *that* brave at his best!”
But townfolk would pat my back and say,
“Koko is the Hero of the West!”

------- O -------

Shubham Sanyal

The Mantra of Life!
Robi Thakoor' “Tomar Holo Shuru”

My task here is done,

While yours has just begun.

And thus 'tween you and me

Life just ….goes on and on!

.....

Lights brighten up your home

Friends in merry-making spree!

The dark night descends on me,

And stars just lead me on…

My task here is done….while yours has just begun!

.....

You stand firm on solid ground

While I float in the sea.

You can sit back, relax

While I'm on a moving spree.

Your earnings rise every day

My savings are on decay.

The grey future shakes your mind,

….but my worries are all gone!

My task here is done….while yours has just begun!

.....

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য

স্বপ্নআলেখ্য

মালা গাঁথছিলো সুধা। গুনগুন করে গানও গাইছিল। একটা সাদা কাগজ হালকা গন্ধ মেখে ওর ফুলের ঝুড়িতে এসে পড়লো। এদিক ওদিক চাইলো সুধা। একটি মানুষ এগিয়ে আসছে ওর দিকে হাতে এক খোলা খাম। পরণে বিদেশী কায়দার বেশভুষা, শুধু টাই এর বাঁধন আলগা হয়ে একদিকে হেলে গেছে। সুধার কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সেই মানুষ। ফুলের ঝুড়িতে সুগন্ধি কাগজ তখন হালকা হাওয়া পেয়ে তিরতির করে কাঁপছে। দাড়ি গোঁফ কামানো পরিপাটি মানুষটি সেইদিকে তাকিয়ে হাসলো আর জিগ্যেস করলো এমন সুন্দর মালা যে গাঁথতে পারে তার নামটাও নিশ্চয়ই ...

কথা শেষ হবার আগেই উত্তর আসে, সুধা।

আলতো হাতে ফুলের ঝুড়ি থেকে কাগজের টুকরোখানি তুলে নিয়ে মানুষটি মনে মনে বলে উঠলো, বন্যা তুমি ফুলের সৌরভে সুধাময়ী।

কে গো তুমি আমার বন্ধুর সাথে ? তুমিও কি বিদেশী ? অনেক দূরের পথ হেঁটে পাহাড় ডিঙিয়ে মেঘের দেশে যাও ?

মানুষটি উঠে দাঁড়ায়। কাগজের টুকরো হাতে ধরা, নীল রঙের খামটাও খোলা। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে । তুমি কি করে জানলে যে আমি মেঘের দেশে যাবো ?

– আমি সব জানি। আমায় রাজার দূত বলেছে। জানো কি রাজাও আসবে বলেছে। তবে আগে তোমার হাতের ওই কাগজে কি লেখা আছে বলো?

– এটায় ? এটা রানীর চিঠি।

– তাই ? জানো আমাকেও রাজা চিঠি দেবে। রাজার অনেক ডাকহরকরা আছে, ওদের রাজার দেওয়া পোশাক আছে। তোমার রাণীর নাম কি গো?

আমার রানীর নাম বন্যা। কিন্ত তোমার নাম কি ? তুমি এরকম উদাস হয়ে জানলার কাছে কেন ?

আমি ?

– আমি অমল। আমায় কবিরাজ মশাই বেরোতে বারণ করেছে, আমার খুব কঠিন অসুখ করেছে।

– অসুখ আবার কঠিন হয় নাকি ?

– হয় না বুঝি ?

– আরে আমার তো কতই অসুখ করে। আমি তো সহজ করে নি ওদের।

– তুমি কে গো ? কি নাম তোমার ?

– আমার নাম ? আমায় রানী মিতা বলে ডাকে।

মিতা, মিতা মনে মনে বলতে থাকে অমল।

তুমি কি মেয়ে ? সুধা প্রশ্ন করে। এমন নাম কেন ?

টাই এর বাঁধন আরো আলগা করে সেই মানুষটা বলে ওঠে, ঠিকই তো, এটা তো ভাবিনি। তবে কিনা রানীর দেওয়া নাম তো, ওটাই ঠিক।

সুধা শুধোয়, তুমি কি রানীকে খুব ভালবাসো ?

মানুষটি হাতে ধরা চিঠির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে রানী তো বন্যার মত ভালবাসায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, রানীর ভালবাসা এক চুপকথা হয়ে লেগে থাকে, রানীর ভালবাসা এক আকাশ ছেঁড়া মেঘের দলকে সেলাই করে নক্সা তোলে, রানীর ভালবাসা ভোরের সূর্যের আলোয় পাখিদের চোখ খোলা, সূর্য ডোবা আলোয় নদীর বুক চিকচিক করে ওঠা।

সুধা বলে, রানীরই তো সব ভালবাসা, তুমি বুঝি বাসো না!

এইবার বুঝেছি তুমি কি করে পাহাড় ডিঙ্গাও, কিভাবে মেঘের দেশে ঘোড়া ছোটাও, সব ওই রানীর জন্য, বলে ওঠে অমল।

চুপ করে সুধার গাঁথা মালার দিকে চেয়ে থাকে মানুষটা।

সুধার দিকে তাকিয়ে বলে তুমি ফুল ভালবাস ?

বাসি তো। আর ওই যে অমল, যার অসুখ করেছে ওকেও ভালবাসি।

সহজ সোজা দৃপ্ত ভালবাসার প্রকাশ।

মানুষটা অবাক হয়ে সুধার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নিজে নিজে বলে ওঠে

তোর মন খারাপ হয় ?

আমার হয়, আমি মন খারাপের খয়েরী রং মেখে বেরিয়ে পড়ি অনেক দূর যাবো বলে।

একটু এগিয়ে আবার ফিরে আসি, দেখি

বৃষ্টি এসে সব রং ধুয়ে দিয়েছে।

ফিরে এসে আবার সাজতে বসি লাল রং নিয়ে। আয়নার সামনে এসে দাঁড়াই, আয়নায় ধূসর রং মেখে মন খারাপ এসে দাঁড়ায়।

সুধা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। অমল বলে ওঠে আহা কি সুন্দর করে কত কি বললে গো! আমায় শিখিয়ে দেবে? আমি রাজা এলে বলবো, হ্যাঁ বলবো যে রানীর মিতা শিখিয়ে গেছে আমায়। তুমি ওই মেঘের দেশ থেকে আমায় একটু ওষুধ এনে দেবে, আমি ঠিক ভাল হয়ে যাবো।

মানুষটা সুধার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, তোমার এই মালা তুমি কি কর ?

– আমি তো বিক্রি করি।

– তুমি দিয়ে দাও তোমার ভালবাসাকে ?

সুধা রাঙা চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে। হাত থেমে যায়। মানুষটা বলে ওঠে আমিও দিয়ে দিয়েছি আমার বন্যাকে।

তোমার বন্যা ? তবে যে বললে রানী ? অমল জানলার গোড়ায় এসে দাঁড়ায়।

সুধা ফুলগুলো নিয়ে এসে অমলের সামনে এসে দাঁড়ায়। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। অমলের জানলার সামনে এসে থামে আওয়াজ। রাজপেয়াদা। অমলকে বলে যায়, আজ রাত গভীর হলে রাজা আসবে, রাজ বৈদ্যও আসবে।

অমল বলে ওঠে, মিতা, মিতা দেখলে ? দেখলে আমি বলেছিলাম না, রাজা আসবে। তোমার রানীও আসবে দেখো।

অমল একমনে চেয়ে থাকে রাজার পেয়াদার দলের দিকে। সুধা সব ফুল নিয়ে অমলের দিকে চেয়ে। রানীর মিতা চিঠির দিকে চাইলো।

এক পশলা রোদ্দুর পত্রে জ্বলজ্বল করছে। ... দূর থেকে দেখবো বলেই কাছে গেছিলাম ... এক্কা দোক্কা সময় ঠাওর হয়নি।

দুরন্ত গতির ম্লান মুখ, শ্রান্তির অবসানে

ভোরের স্নান, রাত পাখির গান মিশে,তারাদের উজ্জ্বল হওয়া দেখলাম

দূর মেপে কাছে গিয়ে।

রাত খসে ভোর হওয়া দেখতে দেখতে ... শিশিরে গা ভেজানো সকাল আমায় রোদ চশমা পরিয়ে দিল।

আমি গাঢ় ছাই রংয়ের প্রকৃতির কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমায় জাগিয়ে দিও।

পত্রের ভিতর জলছবির মত ভেসে ওঠে সেই পাহাড়ের বড় পাথরে যেখানে অমিত প্রথম হাত ধরেছিল লাবন্যর সেই জায়গাটা। অমিত পিছন ফেরে, অমল বলে ওঠে মিতা দেখো ওই যে তোমার রানীর রথ আসছে, তোমায় নিয়ে যাবে বলে। অমিত তাকিয়ে দেখে মেঘের দল ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভেসে যাচ্ছে, আর কেউ নিপুণ হাতে সেলাই করে দিচ্ছে। সুধার ফুলগুলোর তৈরী মালার মত। লাবণ্য সুধা একাকার হয়ে অমিত প্রতাপে অমলের মাথায় হাত রাখল, ভালবাসার হাত।

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের কর্মী। বর্তমানে কলকাতা দুরদর্শন ভবনে কর্মরত। বহুদিন থেকেই চলে আসছে সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠ এবং নিভৃত চর্চা। পেশাগত ও পারিবারিক ব্যস্ততায় যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল তাঁর এই সৃষ্টিশীলতার ধারা, সে সময় এক বুধ সকালে আকাশবাণী মৈত্রীতে তাঁর নিজের লেখা পড়তে শোনা (এবং তারপর থেকে প্রায় নিয়মিত সেরার বাছাই এর তালিকায়), তাঁর সাহিত্যচর্চায় নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে। সেই থেকেই চলে আসছে জীবনের জলরঙে স্বপ্ন বোনার কাজ, কখনো ছন্দে, কখনো বা গদ্যে . . .

ব্যতিক্রমী তরুণ কবি

সৈয়দ খালেদ নৌমান

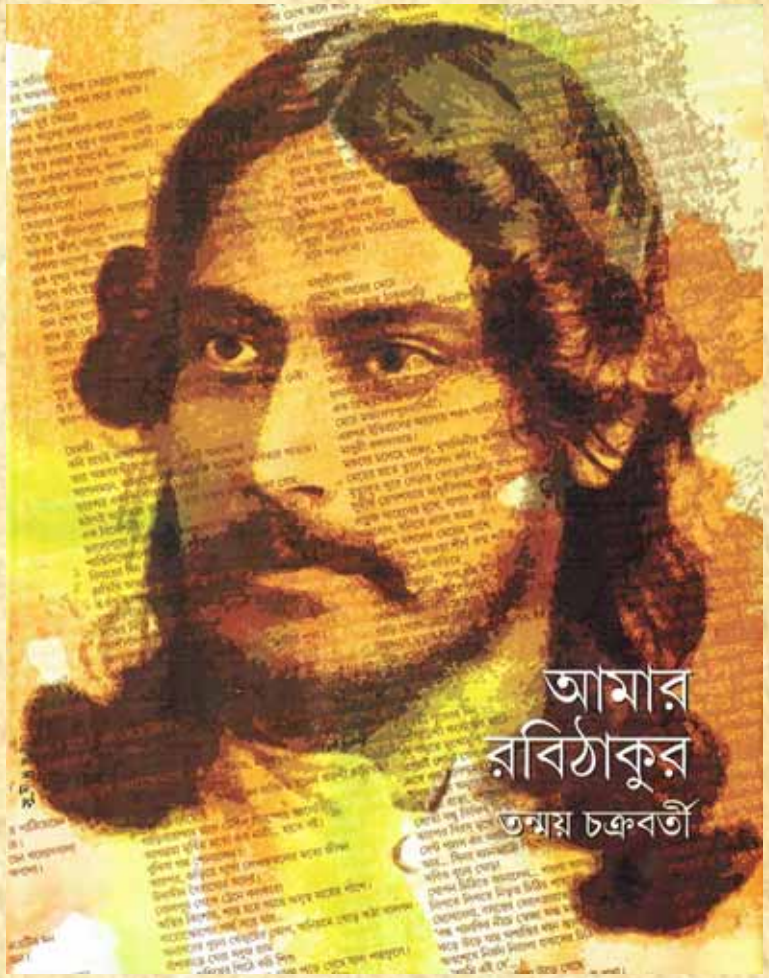

তন্ময় চক্রবর্তী এমন একজন ব্যতিক্রমী তরুণ কবি, যাঁর কাব্যগ্রন্থ পাঠ আমার কাছে একটা বিরল অভিজ্ঞতারই সামিল। মোট ৫৬টি কবিতা সমন্বিত 'আমার রবিঠাকুর' শীর্ষক তন্ময়ের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থটি সম্প্রতি আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে। এই গ্রন্থের সব কবিতাই রচিত হয়েছে কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই। উইলফ্রেড ওয়েন, পাবলো নেরুদা, লুসি, বিবিদি, বিজয়া, খুকু, হৈমন্তী, হেমন্তবালা, নলিনী, মাধুরীলতা, শমী, সরোজিনী, নবীনচন্দ্র, বিবেকানন্দ, আর্থার গেডিস, হার্নার হাইজেনবার্গ, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রমুখ - রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মানুষ-জনেরা যেমন কবিতার বিষয় হয়েছেন, তেমনি আবার পঁচিশে বৈশাখ, শ্রাবণ বাইশে, রবীন্দ্রনাথের শেষ যাত্রা প্রভৃতি নিয়েও অগতানুগতিক ধারায় কবিতা রচিত হয়েছে। আবার 'যেতে যেতে একলা পথে', 'বাঁশিতে ডেকেছে কে', 'নিভেছে মোর বাতি', সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে' প্রভৃতি রবীন্দ্র সংগীতের চূর্ণ পংক্তির উদ্ধৃতি সহযোগেও কবিতা রূপায়িত করা হয়েছে।

তন্ময় চক্রবর্তীর কবিতার ভাষা, চিত্রকল্প ও ছন্দের অবয়ব শোভন, সুগঠিত ও পরিশীলিত। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে হৃদয়ের গভীর অনুভব ও উপলব্ধিগুলিকে কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি ধ্বনিত করতে চেয়েছেন। সহজ ভাষায় কবিতা রচনার নৈপুণ্য তার করায়ত্ত। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মুগ্ধতা চেপে রাখা যায় না। ভালো লাগার পরম স্নিগ্ধতায় মন ভরে ওঠে। এটা অবশ্যই সত্যি যে, তন্ময় 'কলমে কালি নয়, আলো ভরে যেন কবিতাগুলি রচনা করেছেন।'

রবীন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ে মাধুরীলতার বিয়ে হয় চোদ্দ বছর বয়সে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে এবং বিয়ের পর মজঃফরপুর চলে যান। কিছুদিন পর শরৎবাবু বিলেত চলে যান ব্যারিস্টারি পড়তে, আর মাধুরীলতা ফিরে আসেন কলকাতায়। তারপর ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যা নেন মাধুরীলতা এবং শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটে। 'মধুরীলতা' শীর্ষক কবিতাটি বিবরণমূলক। এই বিবরণমূলক রচনারীতি তন্ময় তাঁর সব কবিতায় ব্যবহার করেছেন। যদিও এতে তাঁর নিজস্বতা প্রস্ফুটিত হয়েছে। কবিতাগুলি গদ্যবাচনেই রচিত। তবে উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা নেই, মৃদু হার্দ সুরে উচ্চারিত তার কবিতা – কিন্তু মর্মে উপলব্ধি করা যায়। 'মাধুরীলতা', 'শমী', 'শেষযাত্রা', 'গানের পালা সাঙ্গ মোর', 'শ্রাবণ বাইশে' প্রভৃতি কবিতায় মৃত্যু উপলব্ধির যন্ত্রণাও বিষাদ স্তরে স্তরে উন্মোচিত হয়েছে। যেমন : কবি এসে বসলেন মেয়ের পাশে /

বিছানায় মিশে যাওয়া শীর্ণ রুগ্ন শরীর / সরু হাত দুখানি বাড়িয়ে / মাধুরীর আবদার, 'বাবা গল্প বলো' / কবির চোখে জল ভরে ওঠে । / সেদিন সকাল গড়িয়ে সবে দুপুর, বাড়ির সামনে জটলা / গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন / বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ, ফিরে গেলেন নিঃসঙ্গ কবি । / উড়ে গেল পাখি / আর কিছু গল্প বলা মধ্যদুপুর । (মাধুরীলতা)

'আমার রবিঠাকুর' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায়ই তন্ময় কথা দিয়ে যেন ছবি এঁকেছেন । ইমপ্রেশনিস্ট ছবিতে ও সুররিয়ালিস্ট কবিতায় যার আভাস পরিলক্ষিত হয় । যেমন :

১. ঘরের ভিতর কুয়াশা / চোখ ধাতস্থ হলে বোঝা যায় / মুখোমুখি দুজন, . . . পাবলো ও রবি (পাবলো ও রবি)

২. কোপাই নদীর পাড়ে সন্ধে নেমেছে / শেষ বিকেলের পাখি / . . . সাঁওতাল পাড়ায় কাজ সেরে ফিরছেন ক্লান্ত পিয়র্সন । (দুঃখ রাতে হে)

৩. আত্রেরী নদী । কাজল কালো জল । / নদী পাড়ে নুয়ে পড়া ঘন বাঁশবন । / সন্ধ্যাতারা নদীর জলে । আস্তে আস্তে অন্ধকার । (সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে)

ভাষা, চিত্রকল্প ও গভীরবোধের সমগ্রতায় অত্যন্ত আন্তরিক ও স্নিগ্ধ তন্ময় চক্রবর্তীর 'আমার রবিঠাকুর' এর কবিতাগুলি । পাঠকদের কাছে আদৃত হবে বলেই আমার আন্তরিক কামনা ও দৃঢ় বিশ্বাস ।

তন্ময় চক্রবর্তীর জন্ম সত্তরের দশকে আগরপাড়ায় । আজও মনে পড়ে প্রথম পড়াশোনা করতে যাওয়া নৃত্যকালী পাঠশালায় । সেখান থেকে রহড়া রামকৃষ্ণমিশন । তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর । সম্ভবত পদার্থর সঙ্গে অ-পদার্থতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন সেই সময়েই । তারুণ্যের গোঁফ ওঠার আগেই পত্রিকা করেছিলেন – 'দাঁড়াবার জায়গা' । 'সিন্দাবাদ' নাবিকের ঘাড়ে চেপে বসা বুড়োর মতো কবিতার সেই ভূত তাঁকে আজও ছাড়েনি । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্বশীল পদে থেকেও তার প্রথম, প্রথমতম, প্রথমতর প্রেম – 'কবিতা' । তৃতীয় কবিতা গ্রন্থ তাঁর – আমার রবিঠাকুর । তন্ময়ের নেশা কিংবা হবি বন্ধুরা বা নিন্দুকেরা যে যাই বলুন – গান গাওয়া । গান শোনা । বই পড়া, আর ২৪ ম্যান্ডেভিল গার্ডেন্স-এর দশতলায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘরের রবিবারের আড্ডা, ব্যস এইটুকুই । আর কিছু নয় ।

A Note from the Editor

Satyam Roychowdhury

Rabindranath Tagore wrote with great abundance, even in English. And the present anthology of his English writings purposes to showcase almost the entire gamut. Apart, from the letters, most of the writings are translations. But even as he renders his own writings or Kabir's into English, he transcreates. He writes mellifluously in English just as he does in Bengali, displaying the same confident strength of his genius, the same high norm of stylistic elegance and intellectual brilliance. Tagore's English writings are, to quote D. H. Lawrence in a different context, "the perfect utterance of a concentrated, spontaneous soul", although in a language not his own. His finest single achievement in English is his Gitanjali or Song-offerings which this collection includes. Tagore's English Gitanjali evinces a sensibility of language animated by both a sense of compassion and artifice, taking us to the lofty rendezvous of the poet's intense personal engagement with God. His supreme discourse on the Realization of the Infinite deeply penetrates into the quivering meaning of existence.

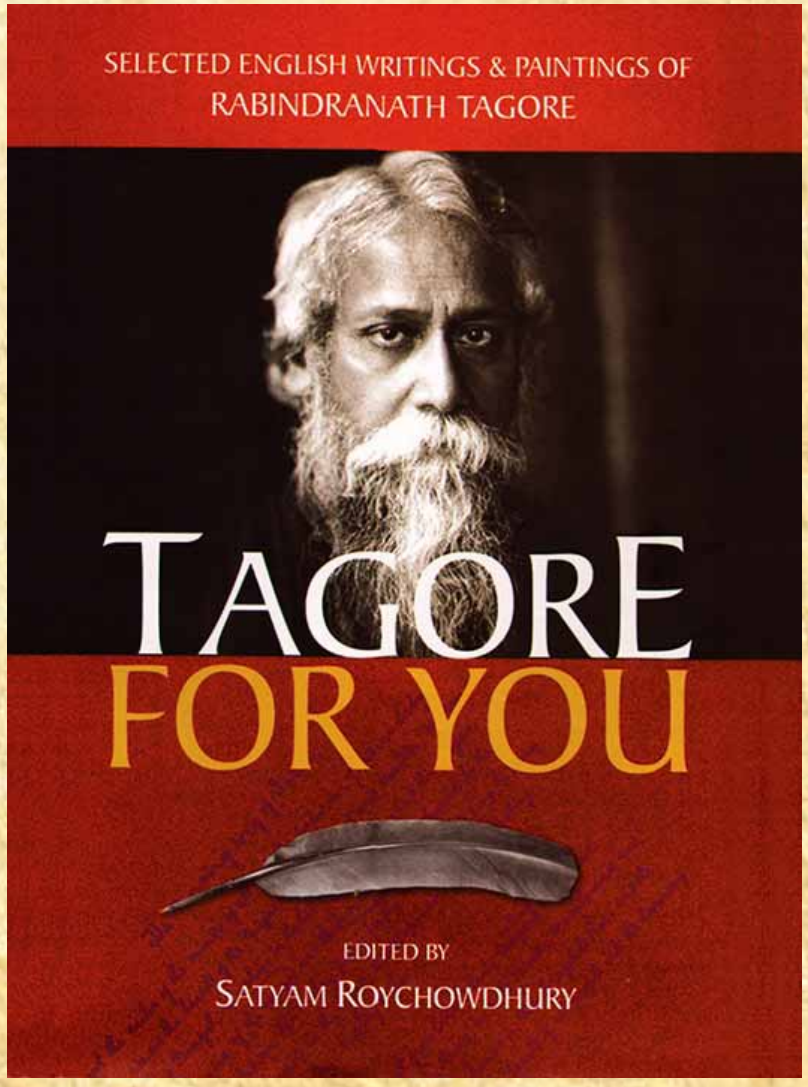

"The Upanishads say: be lost together in Brahma like an arrow that has completely penetrated its target. Thus to be conscious of being absolutely enveloped by Brahma is not an act of mere concentration of mind. It must be the aim of the whole of our life. In all our thoughts, deeds we must be conscious of the infinite. Let the realization of this truth become easier everyday of our life, that none will live or move if the energy of the all-pervading joy did not fill the sky. In all our actions let us feel that impetus of the infinite energy and be glad". As we can see, even in his English writings Rabindranath doesn't let words run away with him. Far too good a craftsman for that, he chooses his words with immense care and displays his usual passionate intensity. And most of his English writings also have the characteristic mystic essence.

However, no selection of Rabindranath Tagore's writings can be universally satisfactory. Differences of opinion will always be true. The writings in this volume have tried to cover the entire range, from the simple to the contemplative, from the dramatic to the narrative, from the passionate to the complex. And all through the volume, in whatever his is writing, he remains unwaveringly Rabindranath. Last but not the least; I would like to thank Sri Baridbaran Ghosh for his immense contribution to the book. It was truly an enriching experience to be associated with someone who has such vast knowledge on Tagore. I sincerely thank Sri Ranjan Banerjee for his crucial inputs which helped in shaping the book; my friends from Deep Prakashan — Sankar da and Diptangshu for their untiring efforts; my family members for their love and support and the wonderful Techno India Group family — my dear students, faculty and staff members, for being there with me at every step of the way.

Satyam Roychowdhury is the Managing Director of Techno India Group and the Chancellor of Sister Nivedita University. He is a fond listener of Rabindrasangeet, also known as Tagore Songs, and is an avid reader. This Book is a collection that celebrates Rabindranath Tagore's (the great poet and Nobel Laureate) short stories, plays, articles and poems. It has been critically lauded and has received wide acclaim across the globe.

"The child who is decked with prince's robes and who has jewelled chains round his neck loses all pleasure in his play; his dress hampers him at every step.

In fear that it may be frayed, or stained with dust he keeps himself from the world, and is afraid even to move.

Mother, it is no gain, thy bondage of finery, if it keep one shut off from the healthful dust of the earth, if it rob one of the right of entrance to the great fair of common human life."

— Rabindranath Tagore

পাড়াতুতো চাঁদ

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী

এক ধরনের গল্প হয়, যা পাঠককে নিবিড়তায় আচ্ছন্ন করে। ইন্দ্রানীর গল্প এই গোত্রের। নিপুন কুশলতায় ইন্দ্রানী তার গল্পের মধ্যে পাঠককে প্রবেশ করান। তার চরিত্র, তাদের অবস্থান, পারিপার্শ্বিককে ছুঁতে ছুঁতে পাঠক এগোতে পারেন অনায়াসে। তার গল্পের মধ্যে আরও একটি গল্প থাকে, সেটাকে ছোঁয়ার জন্য পাঠকের হাতে সুতো ধরিয়ে দেন। সেখানে পাঠকের নিজের এগিয়ে চলার থাকে, খোঁজার থাকে। আবিষ্কারের আনন্দ থাকে। এইখানেই তার গল্পের অন্য মাত্রা যেটা বারংবার এই গল্পগ্রন্থের দশটি গল্পের স্বল্প পরিসরে প্রকাশ পেয়েছে।

কয়েকটি গল্পের বিশেষভাবে উল্লেখ না করে পারা যায় না। যেমন পয়লা আষাঢ় গল্পটি –

"রুবির বাঘের নাম শান্তনু। বাঘ যেমন হয় – পেল্লায়, ডোরাকাটা, বিশাল খন্ড-ত ল্যাজ ..... মিত্র সুইটস আর গাড়ির মাঝখানে ঐ জ্যোৎস্নার ওপর হিসি করছিল শান্তনু – আকাশের দিকে মুখ, সামনের দু'পায়ে শরীরের সম্পূর্ণ ভর, পিছনের পা ভাঁজ করা এবং লম্বা ল্যাজ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল –"

পিছনে পড়ে যাওয়া রুবির ক্রোধ আর ইচ্ছার মূর্তি হয়ে ওঠা এই বাঘ যে কোন মুহূর্তে তছনছ করে দিতে পারে তার চারপাশ। ক্রোধের সেই কালো ডোরার উপর কালো কাপড় ফেলে বাঘ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় রুবি।

কিংবা ক্রায়োনিক্স গল্পে শতদল মেসো যার ধংসস্তূপের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরছিল পবিত্র আর রাস্তার রোলের দোকানের সামনে বসে তাকেই গলা তুলে বলতে শোনে – "বেশ করে লঙ্কাকুচি আর পেঁয়াজ দিও তো আর একটু বেশী সস। একটু বেশী সস, বুঝলে? কাল কম দিয়েছিলে। তোমার দোকানের সস না –

'চ অ ক স' করে তৃপ্তির শব্দ করে মেসো – ঠোঁটে জিভ আর দাঁত দিয়ে – সামান্য থুতু ছিটকোয়।"

তখন প্লাস্টিকের চেয়ারটা অবিকল একটা রথ হয়ে যায়। নটার ট্রেন চলে যায়, কিন্তু মেসোর আত্মহত্যা করার কথা মনে আসে না।

এইরকম সব অন্তরঙ্গ ছবি আঁকেন ইন্দ্রানী। যেখানে কল্পনার বাঘের গায়ের গন্ধ পাওয়া যায় সহজেই, মেসোর রোল খাওয়ার ছবি চোখের সামনে ভেসে থাকে অনেকক্ষণ। এইরকম ছবি জুড়তে জুড়তে পাঠককে হাতছানি দিয়ে নিয়ে যান অনেক গভীরে, যেখানে ভাবতে হয়, অনুভব করতে হয়, একাত্ম হতে হয়।

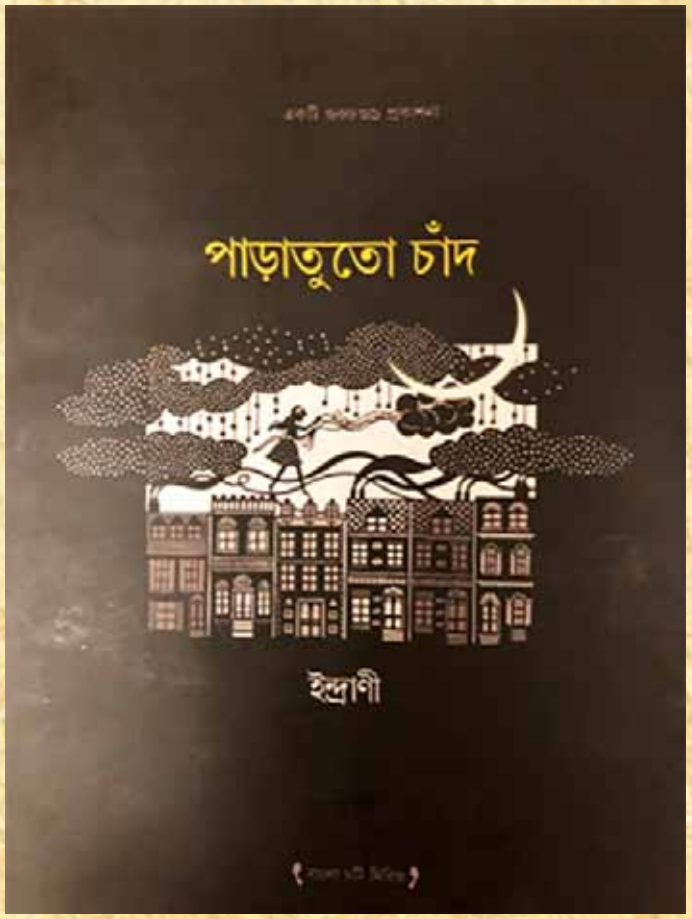

এই সঙ্কলনের আমার অতি প্রিয় দুটি গল্প কুপরিবাহী আর সমরেশের জীবনদেবতা। জীবনস্পর্শ হারিয়ে ফেলা পরিতোষকে আমরা পাই কুপরিবাহী গল্পে। অভিবাসী পরিতোষ জীবনের নীল সবুজ সমুদ্রে নিঃসঙ্গ বাতিঘর যে খুব গভীরভাবে কোন কিছু অনুভব করতে চায় না, নিজেকে সমুদ্রের ঢেউ থেকে বাঁচাতে আবরণ খোঁজে।

সমরেশের জীবনদেবতা গল্প আমার পড়া ইদানীংকালের শ্রেষ্ঠ গল্প – কি অসামান্য দক্ষতায় এই গল্পের নির্মাণ করেছেন ইন্দ্রানী। গল্পের এক অলীক ঘোড়া স্বপ্নে আসে, সেই পক্ষীরাজ লুক্কায়িত পক্ষ বের করে পিঠে মানুষ নিয়ে ইছাবটের দিকে উড়ে যায়। কানেকশনের কি সেই টেকনিক, যার খোঁজে সমরেশ ঘুরে বেড়ায়।

"... মাথা তুলে, চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে, কেশ্র ঝাঁকাচ্ছে সুলতান, শরীরে জ্যোৎস্না পিছলে পড়ছে। আর এক মানুষ তার বাঁধন খুলে দিচ্ছে, তারপর তার পিঠে সওয়ার হচ্ছে। ঘরের দোর খুলে মুখ বাড়ায় সিতাংশুর মা। দেখে, চাঁদের আলো মাখা উঠান, বকুলগাছ। দেখে অনন্ত মায়া। অকস্মাৎ সুলতান তার লুক্কায়িত দুই পক্ষ বের করে আনে, বিস্তার করে, ঝাপটায়। তারপর উড়ান দেয়।" সেই টেকনিক ইন্দ্রানী খুঁজে পেয়েছেন, তার গল্পে আমরা পাই এক উড়ান যা পাঠকের উত্তরণ ঘটায়।

ইন্দ্রানীর গল্প অন্য ধরনের, অন্য ঘরানার। তাহলে কি তার গল্প এক্সপেরিমেন্টাল? বাংলায় অনেক লেখকের এক্সপেরিমেন্টাল লেখা পড়েছি। কিন্তু সেরকম অনেক গল্পে প্রকরণ সরিয়ে নিলে কিছুই পড়ে না থাকতেও পেয়েছি। ইন্দ্রানীর লেখার ভঙ্গী বিরল, নিজস্ব। কিন্তু প্রতিটা গল্পকে তার প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়েছেন, কোন স্টাইলে আটকে থাকেন নি। প্রতিটা চরিত্র তাদের আনুষঙ্গিক, কিছু টুকরো কথা আর মনোজগতের জটিল বিন্যাসে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে থেকেও অধরা থেকে পাঠকের ভাবনাকে সবসময়েই উসকে দিতে থাকে। গল্প পড়া শেষ হয়ে গেলেও ছাড়তে চায় না পাঠককে। অনেকসময় গল্পের ভিতরে ডুবুরীর মত নাবতে হয়, বারংবার। এইখানেই ইন্দ্রানীর সাফল্য।

আমি অস্ট্রেলিয়া নিবাসী ইন্দ্রানীর একটি গল্প "বাতায়নে" পড়েছিলাম আর আরও বেশী বেশী করে পড়ার সুযোগ খুঁজছিলাম। পেয়ে গেলাম এবারের কলকাতা বইমেলায়। গুরুচণ্ডালী প্রকাশনী ইন্দ্রানীর দশটি গল্পের সংকলন এনেছেন 'পাড়াতুতো চাঁদ' গল্পগ্রন্থে। কলকাতার থেকে দূরে থাকেন বলে যদি বাঙ্গালী পাঠক এর লেখার যথেষ্ট খোঁজ না পান, তবে বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য।

বলাকা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ

১৯১৬

মূল্য এক টাকা মাত্র

ISBN 9780648105220